বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ওঁ
ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ ষষ্ঠ সংখ্যা ◆ মাঘ, ১৪৩২ [জানুয়ারি, ২০২৬]

প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন, ত্রিপুরা প্রান্ত

সেবা কুম্ভ, কৃষ্ণনগর, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত

আমতা শিশু মন্দিরে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক

কল্যাণ বাণী

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্।। ১৮/২২।।

'কিন্তু যে জ্ঞান তুচ্ছ, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীনভাবে একটি মাত্র কার্যদেহকে সমগ্র মনে করে, তাতেই আসক্ত হয়, বলা হয়, সেই জ্ঞান তামসিক।'

সম্পাদকীয়...

সম্প্রতি আর.এস.এস-এর সরসংঘচালক ড. মোহন ভাগবতজি বলেছেন, হিন্দুদের গৃহ হিন্দুদের মতনই সাজানো উচিত। আমাদের চিন্তা করা দরকার, ঘরে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি টাঙানো উচিত নাকি মাইকেল জ্যাকসনের? তিনি আরও বলেছেন, হিন্দুদের একজোট হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু হিন্দুরা একতার জন্য একরূপতাকে জরুরি ভাবেন না। যেখানে পৃথিবীর অন্য জাতিরা বিপরীত চিন্তা করে থাকেন। ইহুদিরা মাথায় ছোট জালিওয়ালা টুপি পরে থাকেন, ফলে সহজে তাদের চেনা যায়। আবার মুসলিমরা উঁচু পায়জামা ও মাথায় জালিওয়ালা টুপি পরেন এবং লম্বা দাড়ি রাখেন যা তাদের পৃথক পরিচয় দেয়। শিখরা মাথায় পাগড়ি পরেন ও অন্য চারটি ধার্মিক বস্তু নিজেদের সঙ্গে রাখেন, ফলে সহজেই ওনাদের শিখ বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু হিন্দুদের মাথায় তিলক কিংবা হাতে কলাওয়া (রক্ষা সুতো) বাঁধতে খুব একটা দেখা যায় না। হয়ত তারা লজ্জাবোধ করেন কিংবা নিজেকে অসাম্প্রদায়িক দেখানোর জন্যই তারা তা পালন করেন না। সনাতন ধর্ম কিংবা সনাতন ধর্মের থেকে উৎপন্ন পন্থীদের মধ্যে এই ধরনের একরূপতা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না, বিশেষ কোন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান বাদে। বাস্তবে একরূপতা কিংবা ধার্মিক পরিচয় একটি সংস্কারের বিষয়, যা বর্তমানে কেবলমাত্র পূজা-পার্বণ পর্যন্তই সীমিত হয়ে গেছে। এইটি প্রাথমিক সংকেত দেয় যে, হিন্দুরা তাঁদের মূল্যবোধের শিকড় থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মুনি ঋষিদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যাঁরা পুজো, পার্বণ, ব্রত, উপবাস, উৎসব ইত্যাদি বহু পারম্পরিক প্রথাকে হিন্দুদের ডি.এন.এ-র সঙ্গে মালার মতো জড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তাই না চাইলেও মানুষকে ওইসব মেনে চলতে হয়। যার ফলে সংস্কার ও সংস্কৃতি বংশ পরম্পরা অনুসারে সততই চলে আসছে। এইটা ঠিক যে কেবলমাত্র সত্য উচ্চারণ করলেই দেশ মহান হয়ে যাবে না, কিংবা বিকশিত হবে না। কিন্তু এর সঙ্গে গুরুকুল শিক্ষা পদ্ধতির মতো স্বাবলম্বন, স্বাভিমান ও স্বনির্ভরতার শিকি ভাগও যদি হিন্দুরা তাঁর শিশুদের মনে জাগ্রত করতে পারেন, তাহলে দেশকে মহান ও বিকশিত রাষ্ট্র হতে কেউ রুখতে পারবে না। এই সত্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের আর্থিক, সামাজিক, সামরিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি শক্তি সঞ্চয় করার পথেও কাজ করতে হবে, কারণ বিশ্ব শক্তিকেই ভক্তি করে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত গঠন করার স্বপ্ন আমাদের সামনে লক্ষ্য রূপে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা আজও অনেক পিছিয়ে আছি। বিশ্বগুরু হবার পথে একটা বড় প্রমাণ **ISRO** সম্প্রতি দেখিয়েছে, আমেরিকার একটি কোম্পানির ৬১০০ কেজি ওজনের স্যাটেলাইট ব্লু বার্ড ব্লক ২ (**Blue Bird Block 2**) সফলতা পূর্বক মহাকাশে স্থাপিত করে। এত কম খরচে, সুরক্ষিতভাবে এটা সফল করা অনেক বড় দেশও সম্ভব করতে পারেনি। এই স্যাটেলাইটের মদতে পৃথিবীর যে কোন কোণা থেকে বিনা টাওয়ার, বিনা নেটওয়ার্কে মোবাইল ফোন দ্বারা ভিডিও কল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করা যাবে। এটি ভবিষ্যতের বড় গেম চেঞ্জার হবে। ভবিষ্যতে মহাকাশ যুদ্ধেও এটির মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ভারত যে দ্রুততার সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞানে আত্মনির্ভর হচ্ছে, তার পেছনে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কঠোর পরিশ্রম রয়েছে, ওঁনাদের সফলতার জন্য অভিনন্দন জানানো দরকার।

সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা বিধানসভায় বহুবিবাহ রোধ করার জন্য আইন পাস করিয়ে নিয়েছেন। এর ফলে আসাম রাজ্যে একের অধিক বিবাহ করা অপরাধের শ্রেণিতে এসে গেছে। এখন প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন, বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত, সম্মতি থাকার শর্তে দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে আনা অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই অপরাধের জন্য ৭ বছরের জেল হবে, কিংবা তার এই কাজে কেউ সহযোগিতা করলে তারও জেল হবে। হেমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেছেন, তাঁর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে সমান নাগরিক সংহিতা অর্থাৎ ইউ.সি.সি লাগু করা। এর ফলে সবার উপর একই আইন এবং একই নিয়ম চালু হবে। কোন জাতি বা মজহবের আড়ালে এমন কোন কাজ করতে পারবে না, যা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। এই ধরনের দৃঢ় পদক্ষেপ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

ভারত কি কোন ধর্মশালা, যেখানে যে কেউ মুখ উঠিয়ে অবৈধ রূপে প্রবেশ করে আসবে এবং অধিকার চাইতে থাকবে! গত ২রা ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এক মামলার শুনানির সময় আবেদন কর্তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের কি লালকার্পেট বিছিয়ে স্বাগত জানানো দরকার? ওদের কি কোনও আইনগত মান্যতা আছে? যদি না হয় তাহলে কি তাদের কেউই ওদের আইনী অধিকার চাইতে এখানে আসতে পারে?' প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, উত্তর ভারতের সীমান্ত অঞ্চল সংবেদনশীল। ওইখানে অন্য দেশ থেকে মানুষ অবৈধ পদ্ধতিতে, সুড়ঙ্গ বা কোন গুপ্ত পথ ইত্যাদি মারফত অনুপ্রবেশ করে

ভারতবর্ষে আশ্রয়, ভোজন, বাচ্চাদের শিক্ষা প্রভৃতির অধিকার চাইতে লাগলে। আইনের অসৎ ব্যবহার করে এই বিষয়টি টানা কি উচিত? আমাদের বাচ্চারা কি এইসব সুবিধার অধিকারী নন? কোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছে জানতে চাইছে, এমন কোন কি আইন প্রণোয়ন আছে কিংবা আধিকারিক আদেশ আছে যা (পরিপ্রেক্ষিতে) রোহিঙ্গাদের শরণার্থী ঘোষিত করে? যদি কোন আইনি মান্যতাই না থাকে, তাহলে কোন ব্যক্তির অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে রাখার দায়িত্ব কি আমাদের হওয়া উচিত? যদি কেউ নিজের দেশে সত্যি সত্যি ধার্মিকভাবে কিংবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হন। তাহলে ভারতের শরণ নেওয়ার জন্য একটি আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে শরণ নিতেই পারেন। কিন্তু অবৈধ রূপে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আইন অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। প্রধান বিচারপতির এইসব প্রশ্ন দেশবাসীর ভাবনার অনুরূপ বলে ভাবা উচিত।

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জালিয়াতি, প্রতারণা আটকানোর জন্য কেন্দ্র সরকার মানুষকে সতর্ক করে নানাভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতারণা রুখবার জন্য 'সঞ্চার সাথী' নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে কেন্দ্র সরকার। তাদের দাবি, এই অ্যাপ ডাউনলোড করলে ভুয়ো ফোন, মেসেজ, জালিয়াতি, প্রতারণা, মোবাইল ফোন চুরির মতো বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ১.৫ কোটির বেশি মানুষ ইতিমধ্যে এই অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন। ৪১ লক্ষ বেআইনি মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ২৬ লক্ষ হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল চিহ্নিত করে ৬ লক্ষ মোবাইল ফোন ফেরত দেওয়া হয়েছে। ফলে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার চেয়েছিল মোবাইল ফোন তৈরির সময় এই অ্যাপ যাতে ইনবিল্ড থাকে। কিন্তু বিরোধী দলগুলি, পেগাসাস স্পাইওয়্যারের মতো 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপকেও আড়ি পাতার ব্যবস্থা বলে হৈচৈ শুরু করে। তাই ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে আগের অবস্থান থেকে সরে আসে কেন্দ্র সরকার। ভাবা দরকার কেন্দ্র সরকার সত্যিই কি ১৪৫ কোটি মানুষের উপর নজরদারি করতে চাইছেন? এর কি কোন প্রয়োজন আছে? ১৪৫ কোটি লোকের উপর নজরদারি রাখার জন্য কত বড় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে হবে, ভাবা দরকার না? এইসব কথা ভেবে মনে হচ্ছে সারবত্তাহীন অভিযোগ তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াসই বিরোধী দল করছে। এটি ঠিক যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার বা গোয়েন্দা দপ্তর কিছু কিছু মানুষের ফোনে আড়ি পাতে। কিন্তু তার জন্য আদালতের আদেশ থাকে কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সাধারণত মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন অ্যাপ ডাউনলোড করার সময় এই ধরনের পারমিশন প্রায়ই দিয়ে থাকেন। বাস্তবে এই 'সঞ্চার সাথী' অ্যাপ ইনস্টল করানোর পিছনে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ধরনের জালিয়াতি বা ফ্রড রোখা। যাই হোক এটি এখন উপভোক্তার ঐচ্ছিক বিষয়, তারা ভাববেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণহীন ভাবে এই ধরনের অভিযোগ তোলা কতখানি যুক্তি যোগ্য তা ভাবা দরকার। শুষ্ক অভিযোগের চেয়ে তথ্য-প্রমাণ বেশি গ্রাহ্য।

বাংলাদেশে ভয়ংকর অস্থিরতার মধ্যে, যেখানে আমেরিকার দ্বারা চাপানো মোহাম্মদ ইউনুসের সরকার ব্যর্থ। সেই সময় ১৭ বছর ধরে নির্বাসিত পূর্ব প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারিক রহমান বাংলাদেশে ফেরত এলেন। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি-র (বি.এন.পি) লাখো সমর্থকরা তাকে স্বাগত জানিয়েছে। তারিক রহমান এখনো পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাবা হচ্ছে তিনি ইউনুস কিংবা শেখ হাসিনার নীতি মেনে চলবেন না। তিনি বলেছেন, দিল্লি বা পিন্ডী নয়, বাংলাদেশ প্রথম, তিনি এই নীতিতেই চলবেন। শেখ হাসিনা যেখানে পাকিস্তান কিংবা চীন উভয় থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন, সেখানে ইউনুস পাকিস্তানের ইশারায় এবং চীনের সমর্থনে দেশ শাসন করে চলেছেন। ইউনুস হিন্দু এবং ভারত বিরোধী বলে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিন্তু তারিক রহমান ভারতের বর্তমান শক্তির সম্পর্কে অবহত, তাই তিনি হয়তো ভারতের প্রেমী হবেন না, কিন্তু বিরোধীও হবেন না। এই কারণে তিনি জামাত-এ-ইসলামের কট্টরপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদানকে ভুলিয়ে দিলে চলবে না। কিংবা সেই সময় যারা বাংলাদেশের মানুষের উপর অত্যাচার করেছিল, তাদেরকেও ভুললে চলবে না। তিনি বলেছেন ধর্ম যে কারো ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশি নাগরিকদের সকলেরই সমান অধিকার আছে। তিনি ইউনুস পরিচালিত সরকারের কাছে হিন্দু নাগরিকদের সুরক্ষার দাবী করেছেন। তিনি যে অতিবাদী নন, তার প্রমাণ মহিলাদের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়ার কথায় প্রমাণ দিয়েছেন। তারিক রহমান গণতন্ত্রের পক্ষধর এবং ই-গবর্নেন্স, পারদর্শিতা, জবাবদিহি, অন্যায় সংশোধন করার পক্ষে তার বক্তব্য রেখেছেন। তিনি এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এখন সময়ের অপেক্ষায় বাংলাদেশের হিন্দুরা যেমন আছেন, আমরাও তেমনি। আশা করি প্রতিবেশী দেশে সবাই সুরক্ষিত থাকবে এবং ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

ফাল্গুন ১৪৩২ (ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) : সরস্বতী পূজা, শিবরাত্রি, মাঘী পূর্ণিমা, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী, দোল যাত্রা, বিবিধ।

চৈত্র ১৪৩২ (মার্চ, ২০২৬) : চৈত্র প্রতিপদা, রামনবমী, মহাবীর জয়ন্তী, হনুমান জয়ন্তী, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, চৈতন্য মহাপ্রভু বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের
বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ॐ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪
দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

pnb
SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP
9038149815m@pnb
MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ✻ ষষ্ঠ সংখ্যা ✻ মাঘ, ১৪৩২ (জানুয়ারি, ২০২৬)

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর
● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস
● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল
● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)
● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৩
বন্দেমাতরম্ সংগীত—অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর বেরা ৬
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত অধিনায়ক : নেতাজি—আদিত্য দেব ৮
নেতাজির জীবনে স্বামীজির প্রভাব—পারমিতা পাল ১০
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত—ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ১২
রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ —সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ১৫
পৌষ সংক্রান্তি—আলপনা ঘোষাল ১৮
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ—অমলকান্তি দাশ ১৯
মন্দির-মঠ ও অর্চক পুরোহিতের ভূমিকা হিন্দু জীবনে —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ২২
আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জনস্বাস্থ্যের রক্ষাকবজ : আয়ুর্বেদ ও যোগ—অধ্যাপক দেবাশিষ চট্টোপাধ্যায় ২৬
প্রদর্শনের নয়, গণতন্ত্রের দর্শন : সংবিধান —রাজকুমারী মাহেশ্বরী ২৮
হিন্দু সমাজ ক্ষয়িষ্ণুর পথে —সুধাংশু কুমার পাত্র ৩১
কেন্দ্রীয় প্রন্যাসী মণ্ডলের বৈঠক ৩৩
লোভ রহিত, কর্ম করতে হুए, সৌ বর্ষ জীয়েঁ —অরুণ চুড়ীবাল ৪১

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি (বিশেষ সংখ্যা)

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com
প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **WhatsApp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

বন্দেমাতরম্ সংগীত

অধ্যাপক বিশ্বেশ্বর বেরা

'বন্দেমাতরম্' সংগীতটি ভারত জাতির অন্তরাত্মা জাগরণের মন্ত্র। এই গানটি দেশ ও জাতির স্বরূপ সন্ধান এবং স্তুতি-বন্দনার গান। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের অমোঘ প্রভাবে পরাধীন ভারতবাসী মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিল এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্বার সাহস ও শক্তি অর্জন করেছিল। 'বন্দেমাতরম্' স্বদেশপ্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্র এবং স্বাধীনতা লাভের মাভৈঃ মন্ত্র।

'বন্দেমাতরম্' গানটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৮৭৫ সালে। তখন এই গানটি সমালোচনা করে নবীনচন্দ্র সেন বললেন, ''দেখ, একটা ভালো জিনিস, কিন্তু আধা-সংস্কৃত আর আধা-বাংলায় লিখে জগাখিচুড়ি করে সব মাটি হয়ে গেল।" এতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা মর্মাহত হলেন। বস্তুত সেই সময়ে 'বন্দেমাতরম্' গানটি লোক সাধারণ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কালীপ্রসন্ন ঘোষকে একটি চিঠিতে দুঃখ করে লিখেছিলেন, ''আমি বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনি বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এই ঈর্ষাপরবশ আত্মোদর পরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, 'বন্দেমাতরম্'।" অলস, অকর্মণ্য, মোহনিদ্রাগত জাতির উদাসীনতায় বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখবোধ করলেও তিনি 'বন্দেমাতরম্' গানের অমোঘ শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার তাঁর কন্যাকে বলেছিলেন, ''একদিন তোরা দেখে নিস্, আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর পরে, এই 'বন্দেমাতরম্' গান দেশের মানুষের বুকের রক্তে নাচন আনবে।"

'বন্দেমাতরম্' দেশমাতার বন্দনার মহাসংগীত। এই গানের প্রথম সুরকার ও গায়ক হলেন বিখ্যাত যদুভক্ত। তাঁর সুরের রাগ ছিল মল্লার এবং তান কাওয়ালি। পরে ১৮৮২ সালে 'বন্দেমাতরম্' গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম্' গানে শত্রুবিমর্দনকারী বরাভয়দাত্রী দেশমাতৃকার ভাবকল্পনার রূপমূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে মহেন্দ্র ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিল—''সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে?" প্রত্যুত্তরে ভবানন্দ গাইতে লাগল—

''শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুতদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলল, ''এ তো দেশ, এ তো মা নয়—।"

একথা শুনে ভবানন্দ বলল, ''আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা—।" এভাবে স্বদেশকে জননীর আসনে বসিয়ে স্বদেশ প্রেমের মন্ত্র হয়ে উঠল 'বন্দেমাতরম্' গানটি। ১৮৯৪ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই 'বন্দেমাতরম্' গানটি গেয়েছিলেন।

'বন্দেমাতরম্' গানটি সম্পর্কে ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে বলেছিলেন—"a parable of patriotism"। বঙ্কিমচন্দ্র এই গানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার ভাবমূর্তি গড়ে তুললেন এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে সেই মূর্তির প্রাণ সঞ্জীবিত করলেন। ঋষি অরবিন্দ বললেন, '''বন্দেমাতরম্' কেবল একখানি গান নয়, এ হল জাতির প্রাণবায়ু দিয়ে গড়া তার জাগরণী মন্ত্র, এ মন্ত্র কেবল বাংলায় নয়, ভারতের নয়, পরন্তু সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার উদ্বোধনী মন্ত্র।" ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত সভায় অগণিত কণ্ঠে 'বন্দোমাতরম্' জাতির মন্ত্র হয়ে উঠল। জাতীয় জীবনে সেদিন ছিল স্বদেশপ্রেমের এক জাগরণী মুহূর্ত। ঋষি অরবিন্দ লিখেছেন—"The Mantra had been given and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriatism." 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি হয়ে উঠল জাতীয় সংগ্রামের বলদীপ্ত যুদ্ধের অভয়প্রশ্ন। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রকে বললেন "the gospel of fearless strength and force"। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সম্পাদিত স্বদেশী যুগের সংবাদপত্রটি নাম

রাখলেন ‘বন্দেমাতরম্’। ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি হয়ে উঠল জাতীয়তাবোধের মহামন্ত্র। ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়কে একসূত্রে বেঁধে দিল। দাক্ষিণাত্যের তামিল কবি সুব্রাহ্মণ্যভারতী ‘বন্দেমাতরম্’ গানকে তামিল ভাষায় লিখলেন এবং কংগ্রেস নেতা ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার নিজের খরচে দশ হাজার কপি মুদ্রণ করে বিতরণ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সালে ১৬ই এপ্রিল তাঁর‘বন্দেমাতরম্’ পত্রিকায় এই গানটিকে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে ঘোষণা করলেন।

‘বন্দেমাতরম্’ গানটি সুদূর ইংল্যান্ডে পত্র-পত্রিকায় বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। ‘টাইমস্’ পত্রিকায় (১২.০৯. ১৯০৬) ড. জি. এ. গ্রিয়ার্সন বললেন, হিন্দুদের কালী নামে ধ্বংস ও সংহাররূপিণী এক দেবী আছে। সেই ভয়ঙ্করী কালীকেই ‘বন্দেমাতরম্’ গানে বন্দনা করা হয়েছে ইংরেজদের ধ্বংস করবার জন্য। পরের দিন এর প্রতিবাদ করে স্যার হেন্‌রি কটন্ ‘টাইমস্’ পত্রিকায় লিখলেন— ‘বন্দেমাতরম্’ হল মাতৃভূমির বন্দনা গান। বঙ্গভূমিকে এখানে মাতৃস্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইংরেজদের ধ্বংস করার জন্য এই গান রচিত হয়নি। এই দুই বিপরীতধর্মী মন্তব্য ইংলন্ডের শিক্ষিতমহলে বাগ্‌বিতণ্ডা সৃষ্টি করেছিল। জে. ডি. এন্ডারসন ‘টাইমস্’ পত্রিকায় (২৪.০৯.১৯০৬) লিখলেন, ‘বন্দেমাতরম্’ গানটি প্রত্যক্ষভাবে মাতৃভূমি বাংলার উদ্দেশ্যে লেখা হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে কালীকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে। এন্ডারসন আরও বললেন, এই গানটির সবচেয়ে মারাত্মক অংশ হল—

‘‘সপ্তকোটী কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্ত কোটী ভুজৈ ধৃতখর-করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।’’

এই কয়টি পঙ্‌ক্তি ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেমের খরা গাঙে বান ডেকেছিল এবং দেশমাতৃকার মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের মধ্যে অমিত শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। এতে এন্ডারসন ক্ষুব্ধ হয়ে স্বদেশী আন্দোলনকারীদের ‘unscrupulous agitators’ বলে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছিলেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘ডন’ পত্রিকায় বললেন— ‘বন্দেমাতরম্’-এর যাদুমন্ত্রে বাঙালীর হৃদয় দেশপ্রেমের আবেগে স্পন্দিত হয়েছে। এই গানটি দেশবাসীর আত্মজাগরণ ঘটিয়েছে এবং সংগ্রামের ভাষাও সুমহান প্রেরণা দিয়েছে। ‘বন্দেমাতরম্’ শুধু গান নয়—এটি জাতির অন্তরাত্মার উদ্বোধনের মন্ত্র। দেশ ও জাতির স্থূল অস্তিত্বের অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং তিনি তাকে মন্ত্ররূপ দিয়েছিলেন ‘বন্দেমাতরম্’ গানে।

‘বন্দেমাতরম্’ গানের আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় গড়ে উঠল ‘বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়’। এই সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। প্রতি রবিবার এই সম্প্রদায় প্রভাতফেরী করে ‘বন্দেমাতরম্’ গান গাইত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ‘বন্দেমাতরম্’ সম্প্রদায়ের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতেন। ‘বন্দেমাতরম্’ গানের আবেগ নিয়ে বহু গানও রচিত হয়েছে। প্রমথনাথ দত্ত গান রচনা করলেন—

‘‘ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাও রে বন্দেমাতরম্।
নিত্য সত্য, স্নিগ্ধ, স্তব্ধ বল রে ‘বন্দেমাতরম্।।’’

শুধু গান নয়—যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর লেখা ‘গ্যারিবল্ডির জীবন-চরিত’ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখলেন— ‘‘গগন বিদারিয়া গাও ‘বন্দেমাতরম্’—স্বদেশানুরাগ ভগবস্তক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভারতে আবার নবযুগের উৎপত্তি হউক।’’ ‘বন্দেমাতরম্’ জাতির অন্তরের স্বতোৎসারিত হৃদয়ার্তি, বলদৃপ্ত জয়ধ্বনি ও মুক্তির মন্ত্র। সভা-সমিতিতে, মিটিং-মিছিলে, লাঠি-বেয়নেটের মুখে, রাইফেলের গুলির জবাবে নিরস্ত্র ভারতবাসীর একমাত্র হাতিয়ার ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র। আন্দামানের সেলুলার জেলে, বার্মার মান্দালয়ে, বক্সারে, হিজলিতে, আলিপুরে সর্বত্র কারাপ্রাচীর কেঁপে উঠেছিল ‘বন্দোমাতরম্’ অভয় মহামন্ত্রধ্বনিতে। কোটিকণ্ঠ কলকল—নিনাদকরালে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে এক দৃঢ় সংকল্প ও দুর্জয় সাহস সঞ্চারিত হয়েছিল। *(ক্রমশঃ)*

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা-২০২৬

বিশ্ব হিন্দু বার্তার স্টল ২৫৬, ৫নং গেট

আমাদের স্টলে আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। এখানে ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও বর্তমানের রচিত গ্রন্থের বিরাট সংগ্রহ পাবেন। বাংলা ইংরাজি এবং হিন্দি ভাষায় গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারবেন এখান থেকে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত অধিনায়ক : নেতাজি

আদিত্য দেব

মহান বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ ঘোষের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য এবং জীবনব্রত। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লন্ডনে আই.সি.এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন সুভাষচন্দ্র, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরি করবেন না বলে তিনি তাঁর দাদাকে চিঠি লিখে জানান। মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত স্বামীজির এই মন্ত্র তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনন্য সাধক ও গুণগ্রাহী। তিনি বলেছিলেন, 'স্বামীজি জীবিত থাকলে তাঁকে আমি গুরুপদে বরণ করতাম।' স্বামীজির ত্যাগের আদর্শে সুভাষচন্দ্র বোস এমনই অনুপ্রাণিত হন যে, একবার সন্ন্যাসী হবার বাসনায় গৃহত্যাগও করেছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁর জন্য অন্য কাজ বরাদ্দ করে রেখেছিলেন, তাই স্বামীজির প্রেরণার বীজ হৃদয়ে রেখে, জড়িয়ে গেলেন ভারতমাতার শৃঙ্খলা মুক্তির দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। নেতাজি মানেই দেশপ্রেমের অমল কিরণে উদ্ভাসিত জাতীয়তাবাদ। দেশের জন্য সর্বোচ্চ বলিদান এবং চিরন্তন ভালবাসার পরমপ্রসাদ। তাইতো ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মায়ানমারের মান্দালয় পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত মান্দালয় জেল থেকে নিজের মেজ বৌদি বিভাবতী বসুকে লিখেছিলেন, 'এক বছর কাল দেশান্তরিত হয়ে অনুভব করেছি, আমার জন্মভূমি আমার নিকট কত প্রিয়, কত সুন্দর। জন্মভূমিকে এখন যত ভালোবাসি, জীবনে কখনো এত ভালবাসি নাই এর আগে। তাই এই স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির জন্য যদি কষ্ট সইতে হয়, সে কি আনন্দের বিষয় নয়?'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের যে সুবর্ণ সুযোগটি লুকিয়ে আছে, সুভাষচন্দ্র সেটি খুব ভালোভাবে অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ তৈরি হল এবং সে সময় হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি লিখলেন, ''We Don't Want Our Freedom Out Of Britainós Ruin.'' সুভাষচন্দ্র চাইলেন পূর্ণ স্বরাজ, আর গান্ধীজি চাইলেন Dominion অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রানীর হাতে স্বায়ত্তশাসন। (এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এসেছিল।)

তারপর তিনি কংগ্রেস পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করে, একটি নতুন দল স্থাপন করেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। কিন্তু কিছুদিন পরই সাভারকারজি তাঁকে জাপানে গিয়ে, রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। তাই পরিকল্পনা অনুসারে গৃহবন্দী থাকার সময় ৫২ জন পুলিশের নজর এড়িয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তিনি মহা নিষ্ক্রমণ করেন। সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার অবিরাম চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। এই বিষয়ে ট্রিনিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইউনান ও হালপিন তাঁদের 'আয়ারল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম' বিষয়ক গবেষণার সময় তুরস্কের মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত একটি গোপন নথির সন্ধান ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পান। সেই গোপন নথিটি ছিল ইউ.কে হোম ডিপার্টমেন্ট তথা ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের একটি গোপন সার্কুলার, যেখানে লেখা ছিল, ভারতবর্ষের সুভাষচন্দ্র বোস গোপনে কায়রো ইস্তাম্বুলের পথে চলেছেন শত্রু দেশ জার্মানির উদ্দেশ্যে তাঁকে যেখানেই পাও, হত্যা কর। তারিখ ছিল ৭ই মার্চ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।

নেতাজি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১১টি দেশ দ্বারা আজাদহিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার ২ দিন বাদেই ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে, তাদের সম্মুখ সমরে আহ্বান করে, ভারতের স্বাধীনতার লড়াইকে এক অতুলনীয় উচ্চতায় উন্নীত করেছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করে পরাধীন ভারতের প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকা মুক্ত করেছিলেন। নেতাজির নেতৃত্বে গঠিত হয় আজাদহিন্দ ফৌজ (কোহিমা, ইম্ফল, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)। আর এই সশস্ত্র লড়াইয়ের অভিঘাতে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি যে প্রকম্পিত হয়েছিল তা স্বীকার করেছিলেন শত্রুপক্ষের ইউটয়। বিশ্বের ১১টি দেশের আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস স্থাপিত হয়েছিল ও কারেন্সি বা মুদ্রাও ছাপা হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বোস সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। আর সেই অর্থে সুভাষচন্দ্র

বোসকেই ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা উচিত। এত বড় সত্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি কংগ্রেস পার্টি ও তার নেতৃত্ব।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে আমেরিকা, ফলে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে। স্বাভাবিকভাবে আজাদহিন্দ বাহিনীকেও তাদের সামনে আত্মসর্পণ করতে হল। ঠিক হল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস পুনরায় আত্মগোপন করবেন। এইবার তাঁর আত্মগোপন করার পর নেতাজির আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ব্রিটিশরা রেডিও প্রচার করে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট জাপানের টোকিও যাওয়ার পথে তাইওয়ানের তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনা নেতাজির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, নেতাজির শেষ জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত ছায়া সঙ্গী ক্যাপ্টেন হাবিবুর রহমান ওই বিমানে থেকেও কিভাবে রহস্যজনক ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন? গভীর অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ওই দিনটিতে কোন বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি, কিংবা কোনো খবর নথিভুক্ত হয়নি। যদিও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহনাওয়াজ কমিশন এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঘোশলা কমিশন ওই দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর রিপোর্ট দাখিল করে। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার, নেতাজির বিশ্বস্ত শাহানাওয়াজ সুবিধাবাদী কংগ্রেসের রাজনীতিতে ঢুকে চারবার লোকসভায় সংসদ হয়ে একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। আর ঘোশলা কমিটির সদস্যরা ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারার পরেও তারা, তাদের রিপোর্ট দাখিল করেছিল।

এই চক্রান্তকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করতে নেতাজির অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন স্বয়ং প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি, যাঁর সময় ভারতবর্ষে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ভারতে এসে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে যায়, সুভাষচন্দ্র বোসের জন্যই।' আর মাইকেল এডওয়ার্ড লিখেছিলেন, 'গান্ধীজি এবং নেহরু ব্রিটিশ সরকারের কাছে তখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বোস।' যদিও নেহরু সরকারের ষড়যন্ত্রে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভিসন্ধির কারণে স্বাধীনতার পরে নেতাজিকে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়। কারণ নেহরুজি, নেতাজিকে নিজের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। তাই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ নেতাজির পরিবারের উপর কড়া নজরদারি চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিরুদ্ধবাদীরা নেতাজির বিয়ের মুখরোচক গল্প বাজারে ছেড়ে, তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক নীরদ সি চৌধুরী বলেছিলেন, 'নেতাজির মতো একজন ব্রহ্মচারী দেশ নেতা, একজন সাধারণ স্ত্রীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন, এ কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।' জিডি ঘোশলা তাঁর লেখা Lost Days Of Netaji বইতে এমলি ও অনিতাকে সুভাষচন্দ্রের স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে উল্লেখ করে। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ঘোশলার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জিডি ঘোশলা ও তাঁর প্রকাশক ক্ষমা চেয়ে, ওই কথাগুলো বই থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়। নেতাজির রাজনৈতিক সহকর্মী হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত নেতাজির জীবনীতে লেখেন, 'নেতাজি যখন ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে করাচি বিমানবন্দরে উপস্থিত হন, তখন তাকে তাঁর বিবাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তার করার সময় বা অবসর আমার নেই।' অনেকে বলেন এই গল্প রচনা এবং বিমান দুর্ঘটনার মিথ্যা প্রচারের পেছনে মাউন্টব্যাটেন, নেহরুর মত ব্রিটিশ পন্থী ভারতীয় সহযোগীরা ছিলেন।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, নেতাজির মৃত্যু ওই বিমান দুর্ঘটনায় হয়নি এবং জাপানের রণকোজি বৌদ্ধ মন্দিরের রাখা অস্থিভস্ম সুভাষচন্দ্র বসুর নয়। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকে অসম্পূর্ণ বলে, মনমোহন সিং এবং তাঁর সরকার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন লোকসভায়। নেতাজির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে গোপন রাখার প্রচেষ্টা, উপেক্ষা এবং তাকে অবহেলা যে চলে আসছে কংগ্রেস সরকারের সময় কাল থেকে, এই সত্য প্রায় সকলেই জানে। কিন্তু বর্তমানে নরেন্দ্র মোদি সরকারের মান্যতায় গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর, দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটে স্থাপিত হয়েছে নেতাজির ২৮ ফুট উঁচু, ৬৫ টন ওজনের গ্রানাইট পাথরের মূর্তি। আবার নেতাজির জন্ম দিবস ২৩শে জানুয়ারি দিনটিকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদির সরকার এবং যুবকদের নেতাজির আত্মত্যাগ অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিয়েছে। নেতাজির আদর্শ আজও দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ উঠলে নেতাজির অবদান সবার আগে আমাদের কাছে আসে কারণ, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস'ই দেশ ভক্তির তরুণ প্রাণ শক্তির উৎস স্থল। ■

নেতাজির জীবনে স্বামীজির প্রভাব

পারমিতা পাল

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে আইনজীবী জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর গৃহে জন্ম নেয় এক তেজোদীপ্ত জ্যোতির্ময় শিশু, যাঁর নাম রাখা হয় সুভাষচন্দ্র। মাতা প্রভাবতী দেবী ছিলেন ধর্মপ্রাণা নারী। তিনি নিয়মিত দেবী দুর্গা ও মা কালীর পূজা করতেন। মায়ের কাছ থেকেই বাল্যকালে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে স্নেহশীল স্বভাব ও ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যখন কটকে পড়াশোনা করেছিলেন, তখন এক অতৃপ্ত অবস্থা গ্রাস করে তাঁর জীবনকে। ঠিক সেই সময় তাঁর হাতে আসে স্কুলের লাইব্রেরিতে রাখা স্বামী বিবেকানন্দের রচনা। দিনের পর দিন তিনি বিবেকানন্দের রচনায় মগ্ন হলেন। হৃদয়-মন তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল, আমুল পরিবর্তন আসল তাঁর জীবনে। বিশেষ করে স্বামীজির—বলো, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিই কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। এসব পড়ে তিনি যে আদর্শ খুঁজছিলেন যেন ঠিক তা পেয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে নেতাজি বলেছেন ‘‘বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স ১৫ বছর হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল।’’ তিনি নিজেই বলেছেন, ‘‘শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। চরিত্র গঠনের জন্য রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের সাহিত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না। “Vivekananda entered my life”।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সনাতনপন্থী এবং চরম হিন্দুত্ব প্রেমী, তাঁর ভাষণ, তাঁর রচনা, চিঠি পত্রের দিকে খানিক দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারা যায়, তিনি কত বড় হিন্দুত্বের ধারক ও বাহক ছিলেন। ১৯১২ সাল সুভাষচন্দ্র তখন দেশমাতৃকার দেবীমূলে নিজেকে সমর্পণের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন পূজনীয়া মাতাকে একটি পত্র লিখেছিলেন—‘‘শ্রীচরণেষু মা, ভারতবর্ষ ভগবানের বড় আদরের স্থান। এই মহাদেশে লোক শিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু, এতবার তিনি নিজে স্বয়ং কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড় আদরের দেশ।’’ নেতাজির কাছে দেশ ছিল মা। মা মানে সমগ্র মাতৃ জাতি ‘‘মাতৃবৎ পরদায়েষু হিন্দু ধর্মের চিরন্তন বাণী।’’ তিনি বলেছেন, ‘‘আমরা মুখে বলি জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কি আমরা জননী ও জন্মভূমিকে ভালোবাসি? জননীকে ভালোবাসার অর্থ শুধু নিজের প্রসূতিকে ভালোবাসা নয়, সমস্ত মাতৃজাতিকে ভালোবাসা। সে যুগে খনা—লীলাবতীর মতো বিদূষীর আবির্ভাব হয়েছিল। অহিল্লাবাঈ ও ঝাঁসির রাণীর মতো বীর রমণীর অভ্যুদয় হয়েছিল। এ সোনার বাংলায় আমরা একদিন রাণী ভবানী দেবী চৌধুরাণীর মতো রমণী দেখিয়াছিলাম, সেখানে নারী পূজিতা হন, তথায় দেবতারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।’’ স্বামীজি বলেছেন, ‘‘একটা জাতীর উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হল নারী জাতীর উন্নয়ন। নারীরা বীরত্ব ও বীরত্বের চেতনা অর্জন করুক।’’ স্বামীজির নির্দেশিত পথেই নেতাজি তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে ‘রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্ট’ গঠন করেন এবং অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারে একজন নারীকে মন্ত্রী করেন। তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারতপ্রেমী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ঐক্য, বিশ্বাস ও আত্মোৎসর্গের ডাক দিয়েছিলেন। এই তিনটি শব্দই স্বামীজির জীবন থেকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

''মায়ের জন্য বলি দাও''—এই মন্ত্রে তরুণদের মধ্যে নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর এই আহ্বানের প্রভাবেই নেতাজি বলেছিলেন ''তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব। (Give me blood, I will give you freedom)। নেতাজি আরেক জায়গায় বলেছেন ''উপনিষদ থেকে যদি বারবার একটি শব্দ আমার কাছে উঠে আসে তা হল, অভী অর্থাৎ ভয়শূন্য হও।'' কলকাতায় থাকাকালীন প্রায়ই তিনি গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। আর স্নান করতে নেমে সুভাষচন্দ্র আবৃত্তি করতেন, স্বামীজির লেখা কবিতা ''কালী দ্যা মাদার''। শুধু হিন্দু ধর্মে শ্রদ্ধাই নয়, নেতাজি অন্য দেশে হিন্দু ধর্মকে বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''হিন্দু ধর্মকে অ্যাগ্রেসিভ হইতে হইবে।'' আর এ কথা তো সকলেই জানেন যে তিনি ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তান নামেই জানতেন। সেই জন্যই তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর উদ্‌ঘোষ ছিল 'জয় হিন্দ'।

১৯২৪ সালে বহরমপুর জেলে থাকার সময় তিনি হোলি, দোলপূর্ণিমা ও দুর্গাপুজোর অধিকার চেয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখেছিলেন। প্রথমে অনুমতি না দিলেও, তাঁর আন্দোলনের চাপে শেষে বাধ্য হয়ে সরকার পুজোর অনুমতি ও সঙ্গে অর্থ মঞ্জুর করেছিল। ১৯২৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায় কারাগারের ভিতরে দুর্গাপুজো করার দাবি নিয়ে বর্মার ইংরেজ চিফ সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন নেতাজি। আবার ১৯৩০ সালে কলকাতার আলিপুর জেলে থাকার সময় জেলে সরস্বতী পুজোও করেছিলেন অন্য জেল বন্দিদের নিয়ে। এখানেও তাঁর সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাই আমরা। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন নেতাজি, ''জাতিগত বৈষম্য কখনও ভারতের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কেননা তার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করে নিতে এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চারিত করতে সে সমর্থ হয়েছে।''

দেশের যুবকদের নেতাজি বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বামীজির মতো শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল স্বামীজির আদর্শে চরিত্র গঠনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় ভারতে সামাজিক ও সংস্কৃতিক মেলবন্ধনে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা। সুভাষচন্দ্রের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বেড়াজালের বন্ধন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করা। তিনি যুবকদের নারী জাতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন।

নেতাজির কর্ম ও সাধনার মধ্যে স্বামীজির চরিত্রের অপূর্ব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, স্বামীজি যদি গেরুয়া ত্যাগ করিতেন, তবে সে আর কিছুর জন্য নয়, ঐ আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাজি হইবার জন্য। সেই প্রেম তাঁহারও ছিল, কেবল সেই জন্য জ্ঞানে তপস্যাকে সংবরণ করিয়া কিছু কাল প্রেমের সমাধিতে সংজ্ঞাহারা হইতে হইত। অতএব স্বামীজির মধ্যে আমরা যেমন নেতাজির ঐ প্রেমের মূল দেখিতে পাই, তেমনই নেতাজির মধ্যে স্বামীজির সেই বাণীকেই মূর্তিমান হইতে দেখি। সেই এক মন্ত্র—'Believe that you are free and you will be' অতএব একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নির্ভিকতা, জ্বলন্ত দেশপ্রেম, তেজ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশে সুভাষচন্দ্রের মতো আর কোন ভারতীয় নেতা স্বামীজির এত কাছাকাছি আসতেই পারেননি। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা বলতে পারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন বিবেকানন্দের মানসপুত্র। ■

প্রতিবাদ মিছিল, ব্যারাকপুর, দক্ষিণবঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারত

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

উনিশ শতকের নবচেতনার আলোয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবির্ভাবের বিরূপতার পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিসরে উৎকর্ষ মুখর প্রকৃতি আপনা থেকে হয়ে উঠেছিল জনমুখী। বাংলার মাটি হয়ে উঠেছিল নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা। বাংলা হয়ে উঠেছিল সমগ্র ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক। তাতে যাঁদের অবদান একেবারেই অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মানব ধর্মের অন্যতম পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি মানব ধর্মের পূজারী হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস।

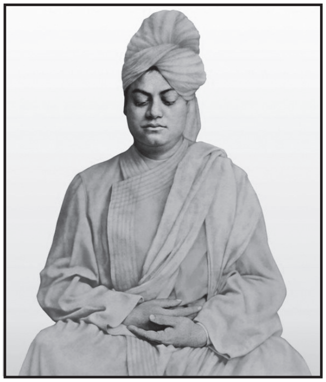

স্বামীজি যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে এলেন, তাঁর অনেক আগে থেকেই তিনি ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র ঘাটাঘাটি শুরু করে, খুঁজেছেন এই পৃথিবী ও মানুষ এবং জীবজগৎ এল কোথা থেকে? এই জগতের স্রষ্টা কে? তাঁর আরো কত কৌতুহল, যেমন—সাধারণ মানুষ যে ভগবানের কথা বলেন, সেই ভগবান কে? তাঁর দর্শন কি পাওয়া যায়? তিনি বিচরণ করতেন অনন্তে, ছাত্র জীবন থেকে অভ্যাস করতেন ধ্যান। বুদ্ধদেবের দর্শন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি সবসময় জানতে চাইতেন, একটি ক্ষুদ্র জীবনে কি মহাজীবন শেষ করা যায়? অনন্তের সঙ্গে সন্তের কি কোন সম্পর্ক আছে? এই জগতের বাইরে পা ফেললে মানুষ যায় কোথায়? এটি কি একটি আলোকচক্র? এ কি কোনও কংসের কারাগার? এই কারাগারে কি ভগবান বিষ্ণু আসেন? বুদ্ধদেব যে নির্বাণের কথা বলেছিলেন, তা কি নির্বাপিত জীবন প্রদীপ? নাকি চিরপ্রজ্বলিত একটি দীপশিখা?

দক্ষিণেশ্বরের সাধক গুপ্ত যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে এলেন এক জিজ্ঞাসু যুবক। তিনি যা খুঁজেছেন তা কোন দর্শনে নেই, ব্রাহ্মসমাজে নেই, রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও নেই। এই গোলাকার বৃহৎ শালগ্রাম সম জগতের আড়ালে কে আছেন? তিনি ঠাকুরকে বললেন, 'মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? আপনি আপনার ওই মন্দিরের মাকালী অথবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এঁদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই না। আমি অসীম অনন্তের খবর চাই। আমি বেদ পাঠ করেছি। অতীত ঋষিদের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। কঠোপনিষদ আমার প্রিয় গ্রন্থ। কিন্তু যমরাজ নচিকেতাকে বলতে পারেননি, মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? আমি সেই বালক নচিকেতা। আমি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমার পিতা একজন বিখ্যাত অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত, আমার মা ভুবনেশ্বরী দেবী'। সেদিন ঠাকুর মৃদু হেসে অশান্ত যুবকটির দিকে দেখে, যুবকটিকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের মধ্যে যে স্নেহের প্রকাশ ঘটেছিল তাতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভীষণ অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এই যুবক নচিকেতার মৃত্যু রহস্য জানতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিতা বিশ্বনাথ দত্ত হঠাৎ মারা গিয়ে এই নচিকেতাকে জানিয়ে গেলেন, জীবনে শোকের কোনো অবকাশ নেই। জাগতিক পিতা চলে গেলেও, তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তৈরি করেছিলেন ইন্দ্রের বজ্রের মতো শক্ত করে। বেদান্তি নরেন মৃত্যুকে দেখতে শিখেছিলেন অন্য চোখে। জীবনের ক্ষয় নেই, লয় আছে। জলের বিন্দু জলেতেই মিলায়, যা আজ আছে এখানে, কাল তা ফিরে যাবে সেখানে। নরেন্দ্র প্রশ্ন করেছিল, ভগবান কোথায়? গুরু বুকে আঘাত করে শিখিয়ে গেলেন, ভগবান এখানে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যথেষ্ট সময় দিলেন, তাঁর না থাকাটাকে সহনীয় করার জন্য, দিলেন সেবার সুযোগ। নরেন্দ্রনাথ এবং অন্য সব যুবক সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ সংঘ তৈরি করে সেবায় নিয়োজিত হলেন। স্বামীজি বলতেন, 'এই দেহটি চলে যাবে, আয় যত পারি সেবা করি। সেবাই ধর্ম। আর যত পারি গ্রহণ করি, গুরুর শিক্ষা, গুরুর দর্শন। জেনে রাখো সুখের কোন অবকাশ নেই।' গতি থমকে যাবে কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের রথের চারটি চাকা, যথা—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চলতেই থাকবে। ঠাকুর চলে গেলেন, নরেন্দ্রনাথের কাঁধে দিয়ে গেলেন একটি নতুন যুগের ভার।

একদিন এক বিদেশিনী মহিলা সাংবাদিক, স্বামীজিকে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিন্দু ধর্মের প্রবর্তন কে করেছেন?' স্বামীজি উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সেই মহিলা সাংবাদিক বললেন, 'তার মানে হিন্দু ধর্মের কোন প্রবর্তক নেই, অতএব হিন্দু কোন ধর্মই না?' তখন স্বামীজি বললেন, 'আপনি একদম ঠিক বলেছেন, হিন্দু কোন ধর্ম নয়। এটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যেমন কোন প্রবর্তক নেই, আসলে অনেক মানুষ, অনেক বিজ্ঞানী সময় সময় নিজেদের আবিষ্কারের অবদান রেখে বিজ্ঞানের শাখাগুলো সৃষ্টি করে গিয়েছেন, হিন্দু ধর্মও হল সেই বিজ্ঞান, যা বহু বছর ধরে সাধু, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী মহাত্মাদের সঠিক মার্গ দর্শনে ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। ইসলাম ধর্মের একটাই ধর্মগ্রন্থ, কোরান। খ্রিস্টান ধর্মেরও আছে একটাই ধর্মগ্রন্থ, যা হল বাইবেল। কিন্তু হিন্দু ধর্মের উপর এত ধর্মগ্রন্থ আছে, যে তাতে একটা লাইব্রেরি হয়ে যাবে। তাই হিন্দু ধর্ম হল একটা বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম, যার নাম সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন প্রভু রামচন্দ্র।' স্বামীজি আসলে, বীরের সাধনার কথা বলেছেন এখানে। শ্রীরামচন্দ্রের পূজা মানেই শক্তির পূজা করা। সনাতন হিন্দু সমাজকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন তিনি। এমনকি তিনি উপদেশ দিতেন, ঘরে ঘরে শ্রীরাম চন্দ্রের পুজো করার। তিনি বলতেন, 'সব জানবি, ঘোর তমো ভাবাপন্ন। তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হলে, মহাবীরের পুজো চালাতে হবে, শক্তিপুজো চালাতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ হবে। নতুবা উপায় নেই।'

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতা সম্মেলনে বক্তৃতা (ক্যালকাটা অ্যাড্রেস) ভারতবর্ষের জন্য এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ওই বক্তৃতায় তিনি ভারতের ঐতিহ্য, দেশপ্রেম এবং সমাজের কল্যাণে ধর্মের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'আমরা হিন্দুরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, যে ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে প্রেম, সহিষ্ণুতা এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সেই ধর্মকেই আমরা ধারণ করি। আমি হিন্দু, গর্বের সঙ্গে বলি আমি হিন্দু। আমাদের ধর্মের মধ্যে আছে একতা, শান্তি এবং সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা।' স্বামীজির মতে একটি জাতি কখনো সফল হতে পারে না, যদি সেখানে সংগঠনের অভাব থাকে। সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না। আমাদের মধ্যে ঐক্য এবং সহযোগিতার অভাব আজও আমাদের সামাজিক অগ্রগতি এবং ক্ষমতার উৎসে এক বিশাল প্রতিবন্ধক। তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষে তিনজন ব্যক্তি, পাঁচ মিনিট একসঙ্গে কাজ করতে পারে না। প্রত্যেকে ক্ষমতা দখল করতে চায়।' স্বপ্নের যে ভারত তিনি অবলোকন করেছিলেন, তা হল ধর্মের অটুট বন্ধনে উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ভারত, চেতনার আলোকে দীপ্ত মহান ভারত।

স্বামীজি সতর্ক করে বলেছিলেন, 'যদি আমরা ধর্ম থেকে সরে দাঁড়াই, তাহলে আমাদের আর কিছুই থাকবে না। ধর্মই আমাদের সব। আমাদের জাতীর জীবনের মূল শক্তিই ধর্ম। এছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। যতদিন ধর্ম বেঁচে থাকবে, ভারতবর্ষ ঠিক থাকবে। ধর্মই ভারতবর্ষের প্রাণ। ধর্ম না থাকলে ভারতবর্ষও থাকবে না। প্রত্যেক দেশের বিশ্বকে দেওয়ার মতো এক একটা জিনিস থাকে, ভারতের পক্ষে তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনশৈলী।' ধর্ম বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বেদান্তের শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের মানবকে শিক্ষিত ও আলোকিত করে তোলা। যে জীবন ধারা আমরা পালন করছি, বা যাকে আমরা আমাদের ওয়ে অফ লাইফ বলে চিহ্নিত করি, সেটি সনাতন ধর্ম এবং সেটি হিন্দুধর্ম। প্রেম, ভালোবাসা এবং সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর প্রাপ্তির সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছিলেন স্বামীজি। ১৪ই জানুয়ারি ১৮৯৯ উদ্বোধন পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বশক্তিমান সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ করে সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামীজি সমাজকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে প্লাবিত করার আগে, প্রথমে আধ্যাত্মিকভাবে প্লাবিত করো। রাজনীতির সাফল্য কিংবা ক্ষমতার স্বাদ ক্ষণস্থায়ী এবং অগভীর। প্রকৃত প্রয়োজন আত্মার অনুসন্ধান, যা চিরকাল ভারতে মূল এবং একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থেকেছে।

নারী শক্তির জাগরণ নিয়েও স্বামীজির ভাবনার কোনো সীমা ছিল না। তাঁর মতে নারী শক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং সম্ভাবনার বিকাশই ভারতের জেগে ওঠার একমাত্র পথ। এর বাইরে দেশের সর্বাধিক, সার্বিক এবং সার্থক উন্নতি কখনো সম্ভব নয়। তাঁর মতে, নারীদের অবস্থা উন্নত না হলে সার্বিক মঙ্গল কখনো সম্ভব নয়। একটি পাখি কখনো এক ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। তাঁর কল্পনার নতুন ভারতে উঠে আসবে, কৃষক, শ্রমিক এবং পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের চেতনায় বিপ্লব ঘটিয়ে। সেই ভারত হবে বিশ্বজয়ী ভারত এবং যার ভিত্তি সম্মিলিত সচেতন

মানুষের ঐক্যের অদম্য শক্তি এবং নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

প্রতিবছর ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তীর তারিখকে রাষ্ট্রীয় যুবদিবস রূপে পালন করা হয়ে থাকে। স্বামীজীর প্রেরণাদায়ক বিচার এবং যুবকদের প্রতি ওঁনার গভীর বিশ্বাসের কারণে এই দিবস পালন করা হয়। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন, যুবসমাজই যে কোন সমাজের মেরুদন্ড এবং তাঁরা সমাজের পরিবর্তন আনতে সমর্থবান। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তাঁর দেওয়া ভাষণ, ভারতের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বৈশ্বিক মঞ্চে স্থাপিত করেছিল এবং তিনি যুবসমাজকে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেখান থেকে। ভারতবর্ষ আজ সবথেকে বড় যুবশক্তির দেশ। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি ২০৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষকে বিকশিত রাষ্ট্র বানানোর আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে স্টার্ট আপ কালচার শুরু হয়েছে, যেমন—ডিজিটাল স্কিল, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI), ডেটা সাইন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে আমাদের দেশ। যুবা উদ্যোমীরা নতুন নতুন বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আসছে, যা আগামী দিনে রোজগার সৃজন করবে এবং শিক্ষাপ্রণালী, উদ্যোগ জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসবে। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষ এক মহান রাষ্ট্র হোক। এই স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য যুবশক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে এবং নিজেদের শক্তিকে দেশের হিতে লাগাতে হবে। উত্তীষ্ঠ জাগ্রত.... ■

তুলসী পূজন, ইছাপুর, দক্ষিণবঙ্গ

তুলসী পূজন, কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

গুরুদ্বারে বলিদান দিবস পালন, ব্যারাকপুর, দক্ষিণবঙ্গ

মধ্যবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক, কৃষ্ণনগর

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

একটা ক্ষোভ বা মনোবেদনা প্রায়ই সংশ্লিষ্ট মহলে আলোড়িত হয় যে দুই মহা প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব সমসময়ে ও অতি কাছাকাছি বাস করলেও তাঁরা একযোগে কাজ করলেন না কেন। আমরা রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কথা বলছি। আবার সেই সঙ্গে আমরা আর এক তৃতীয় প্রতিভা শ্রীঅরবিন্দেরও মুখোমুখী হব। এবং তিনজনের সাদৃশ্য, আপাত বিরোধ ও পরিশেষে একই বিন্দুতে মিলিত হওয়ার উপর আলোকপাত করব। প্রথমে যে মিলনবিন্দুতে এঁরা মহামানবের সাগরতীরে মিলিত হয়েছিলেন, সেই জাতীয়তাবাদের প্রতি এঁদের অঙ্গীকার, অবদান ও গূঢ়েষণার পর্যালোচনা করব।

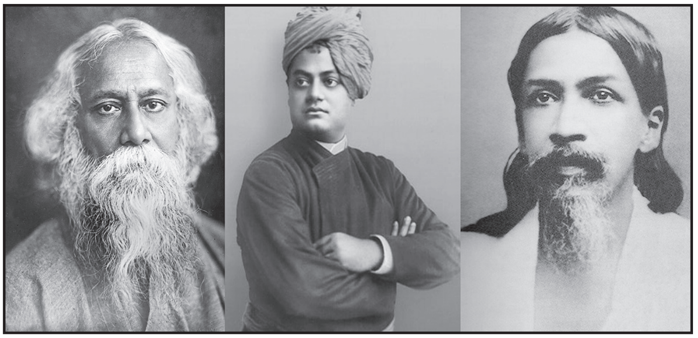

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা, সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী এবং সর্বোপরি অবিসংবাদিত মানবতাবাদী, যিনি ধর্ম, জাত, ভাষা এবং রাষ্ট্র ও জাতি নির্বিশেষে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বুদ্ধিজীবী ও সহানুভূতিশীল মনকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন। ছয় দশক ধরে বিস্তৃত তাঁর সাহিত্য ও শৈল্পিক প্রতিভা, তিনি এক সংবেদনশীল শিল্পী, সহানুভূতিশীল বিদ্বান মানুষ, গভীর চিন্তাবিদ ও নিরন্তর পরীক্ষণরত ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। যদি কেউ তার সর্বব্যাপী বৌদ্ধিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চায় তা, ভুল হবে। তাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদায়ী মতামতের কেবল ইঙ্গিত দেওয়া হবে।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। জাতীয়তাবাদের উপর তাঁর বক্তৃতার সংকলন ১৯১৭ সালে ঐ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে জাতীয়তাবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত, সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে। তার বক্তব্যের সারমর্ম হল যে জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারণা বিস্তৃত মানবতাবাদী অনুভূতির জায়গায় রাজনৈতিক কৌশলের মধ্যে সীমিত থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিস্তার হওয়ায় তিনি একে নিন্দা করে মহামারী হিসাবে ব্যাখ্যা করতে এবং দোষারোপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদের জনপ্রিয় ধারণাকে বাতিল করেছিলেন, কারণ তা অন্য দেশের সম্পদ দখল করাকে রাজনৈতিক ন্যায় বলে চালিয়েছিল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে এটা তিনি বলেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রণোন্মাদ জাতিদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেখে। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। সেই শ্রদ্ধা ভারতের সনাতন ধর্মের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র ভারতই পারবে গোটা পৃথিবীকে সেই রণোন্মত্ততা থেকে বাঁচাতে। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি মূলত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের উপর নির্ভর করে, যেখানে বিশ্ব এক নীড় হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তাই তিনি জাতীয়তাবাদের প্রচলিত ধারণা থেকে একটু সরে গিয়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও কল্যাণের মতো ধারণাগুলোর সঙ্গে একে যুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি আরও যুক্তি দেন যে, যেভাবেই হোক ভারত বিশ্বে অবদান রাখার ক্ষমতা রাখে।

তাঁর মানবতাবাদের ধারণা যে কোনও সীমানা বা বাধা অতিক্রম করে এবং একটা মিলনবিন্দু খোঁজে, যেখানে মানবতাবাদ অন্য যে কোনও পরিচয়ের আগে আসে। তিনি বলেছেন যে নানক, কবির, চৈতন্যের মতো সন্তরা মানবতাবাদের দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন। বর্ণের বিশুদ্ধতা এবং অপবিত্রতার মতো ধারণাগুলো কয়েক শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে দুটো বিশ্বযুদ্ধ এবং অন্যান্য জাতিগত সংঘাত উস্কে দেওয়া হয়েছিল। এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যেখানে নারীপুরুষ নির্বশেষে সবাই সরাসরি বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অতএব তাঁর বিশ্বাস : 'শুধুমাত্র সেই জাতির সভ্যতাই টিঁকে আছে এবং সাফল্য অর্জন করেছে, যাদের মধ্যে সহযোগিতার এই চেতনা প্রবল।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও মনের স্বাধীনতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার ইউরোকেন্দ্রিক ধারণা আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। ইউরোপের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস উল্টে আমাদের দখলের লোভ বাড়িয়ে দেবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। অতএব, আমাদের এই সংকীর্ণতা ত্যাগ করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে আরও উদার হওয়া উচিত, যা মনের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করে। শেষ পর্যন্ত, এই মনের স্বাধীনতা মানুষের আত্মা এবং বৃহত্তর মানব জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পায়। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে শুধুমাত্র একটাই ইতিহাস আছে তা হল মানুষের ইতিহাস, অন্যান্য ইতিহাস বৃহত্তর ইতিহাসের অধ্যায় মাত্র।

আধ্যাত্মিক সংহতি, ভালবাসা এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জাতিরা যে কোনও যুগে স্থায়ী স্থান পেতে পারে। এইভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা যে কোন ধরনের জাতীয়তাবাদ মানবতা ও মানবকল্যাণের সমন্বিত আদর্শের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা একটা চিরস্থায়ী অগ্রগতি হওয়া উচিত, যা ভিতর থেকে শুরু হয়।

আধিপত্যের রাজনীতি ও বিভাজনের তত্ত্বকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের রাজনীতি আজ ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছানো উচিত।

স্বামী বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদের মূলে ছিল অধ্যাত্মবাদ। জাতীয় জাগরণের এই সন্ধিক্ষণে আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় নেতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাবিত জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাক।

বর্তমানে আমরা জাতীয় নেতা বলতে বুঝি এক রাজনৈতিক দলের নেতা বা এমন একজন যিনি সরকারি পদ অলঙ্কৃত করেছেন অথবা জেল খেটেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তেমন কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না বা তিনি কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেননি। তবুও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনে স্বামী বিবেকানন্দ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। এক শতাব্দী আগে যখন স্বামীজি প্রথম ভারতীয় জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন থেকেই তিনি যথেষ্ট পরিমাণে জাতীয় অনুপ্রেরণার অনুঘটক হয়ে উঠেছিলেন, ভারতের পরাধীনতার পর সেই প্রথমবার। তখন থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। পশ্চিম থেকে ফিরে আসার পরে স্বামীজি যে সমস্ত বড় শহরগুলো পরিদর্শন করেছিলেন, সেই সব শহরের ইতিহাসে নজিরবিহীন ভিড় হত স্বামীজির বক্তৃতা শোনার জন্য।

বর্তমানে আমরা সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতাদের খোলা আকাশে অনুষ্ঠিত বিশাল সভা-সমাবেশ দেখতে অভ্যস্ত; কিন্তু সেই সময়ে এই জিনিস অজানা ছিল এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় উৎসব ছাড়া কোনও বিশাল সমাবেশ ভারতে কার্যত খুব বিরল ছিল। কোনো সর্বভারতীয় সংগঠন বা পরিকল্পিত প্রচারণা ছাড়াই স্বামীজি প্রথমবারের মতো এত বিশাল উদ্দীপনা জাগাতে পেরেছিলেন, তা সন্দেহাতীতভাবে দেখায় যে স্বামীজির ব্যক্তিত্ব ও বার্তায় এমন কিছু ছিল যার মধ্যে বিবেককে চমকে দেওয়ার মতো আবেদন ছিল। নিঃসন্দেহে এই আবেদনে একটা শক্তিশালী ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছিল, তবে এর মধ্যে আরও অন্য কিছু ছিল। স্বামীজি যে সভাগুলোয় ভাষণ দিতেন, সেখানে আগত শ্রোতার খুব বড় অংশ সম্ভবত তাঁর ব্যাখ্যা করা দার্শনিক মতবাদগুলোতে খুব বেশি আগ্রহী হত না, তবে তারা অনুভব করত যে তিনি বিমূর্ত দর্শনের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহজনক কিছু বলতেন।

এই বৃহত্তর স্বার্থ কী ছিল তা যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তাহলে আমরা স্বামীজির প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয়তাবাদের চেতনার দিকে পরিচালিত হব। স্বামীজির আগে অনেক ভারতীয়রা পাশ্চাত্য ভ্রমণ করেছিলেন; কিন্তু তারা সবাই সেখানে গিয়েছিলেন শেখার জন্য, পশ্চিমের সবকিছুর প্রশংসা করতে এবং ফিরে এসে তাদের দেশবাসীকে বলতেন যে ভারতীয়রা জাতি হিসাবে অপদার্থ এবং তাদের একমাত্র আশা পশ্চিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তিনি এই ধারাকে উল্টে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে ভারতের মূল আত্মাকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন। ভারতবাসী তার স্ব-মহিনায় ভাস্বর—এ কথা বুঝিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ অন্তরে ও চেতনায় একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রতিটি

জাতির জীবনে একটা আধিপত্য বিস্তারকারী নীতি রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ''প্রত্যেক জাতির মধ্যে, সঙ্গীতের মতো, একটা প্রধান সুর, একটা কেন্দ্রীয় থিম রয়েছে, যার সামনে সকলে নত হয়। প্রতিটা জাতিরই একটা থিম আছে, বাকি সবই গৌণ; ভারতের থিম হল ধর্ম। সমাজ সংস্কার এবং অন্য সব কিছু গৌণ। শ্রী অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পালের মতো, স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়তাবাদের ধর্মীয় ভিত্তির পক্ষে সমর্থন করেছিলেন। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক মতবাদ, ধর্মযাজকীয় সূত্র এবং অপ্রচলিত পোশাকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। ধর্ম দ্বারা বিবেকানন্দ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চিরন্তন নীতিগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করতেন, সামাজিক ও ধর্মীয় মত চাপিয়ে দিতেন না। তাই তাকে গোষ্ঠীবদ্ধতা বা সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাবে না। বিবেকানন্দ মনে করতেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের স্থিতিশীল ভিতের উপর গড়ে তুলতে হবে। অতীতে ভারতের সৃজনশীলতা প্রধানত এবং বিশেষত ধর্মের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছিল। ভারতে ধর্ম ঐক্য ও স্থিতিশীলতার এক সৃজনশীল শক্তি। ভারতে যখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব শিথিল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন এটাই সেই কর্তৃত্বকে পুনর্বাসনের শক্তি দিয়েছিল। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হতে হবে। এই ধারণার সমর্থক হিসাবে, তিনি বেদ এবং উপনিষদের চিরন্তন মূল্যবান চিন্তাসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, যাতে জাতির শ্রীবৃদ্ধি ও তার ব্যক্তিসত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস শক্তিশালী করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দের আত্মা ভারতমাতাকে দেবীরূপে আলোকিত করেছিল। তার কাছে ভারত মানে শুধু ভৌগোলিক সত্তা বা অভিজাতদের জন্য সুযোগের স্বর্গ নয়। তাই বিবেকানন্দ জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্য, তাদের শারীরিক ও নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য এবং তাদের মধ্যে ভারতের প্রাচীন গৌরব ও মহিমা নিয়ে গর্ব করার চেতনা তৈরি করার জন্য কাজ করেছিলেন। তাই তিনি ভারতের আধুনিক জাতীয়তাবাদের একজন মহান স্থপতি হিসেবে সমাদৃত হন। ডক্টর রাও এর ভাষায়, ''দেশপ্রেম মানে দেশকে ভালবাসা এবং দেশ মানে তার জনগণ, শুধুমাত্র বিবেকানন্দই ধর্মের মাধ্যমে এই পথে এসেছিলেন।''

বিবেকানন্দের দেশপ্রেম : বিবেকানন্দ একজন প্রবল দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং দেশের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিল। তিনি ছিলেন আবেগময় দেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক। ব্যক্তির সমন্বয়ে একটা জাতি গঠিত হয়। তাই বিবেকানন্দ জোর দিয়েছিলেন যে সকল ব্যক্তির পুরুষত্ব, মানবিক মর্যাদা এবং সম্মান বোধের মতো মহৎ গুণাবলী গড়ে তোলা উচিত। এই ব্যক্তিমুখী গুণাবলী ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা পরস্পর পরিপূরক হতে হবে। নিঃস্বার্থ সেবার গভীর অনুভূতি ছাড়া জাতীয় সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলা নিছক বাগাড়ম্বর হত। দেশ ও জাতির অহংকারের সঙ্গে নিজের অহংকারকে একীভূত করা অপরিহার্য ছিল।

একজন তাত্ত্বিক ও শিক্ষক হিসেবে বিবেকানন্দ দেশকে নির্ভীকতা ও শক্তির ধারণা দিয়েছেন। তাঁর অসামান্য উত্তরাধিকার এই যে তিনি জীবন ও ধর্মের সমন্বয় সাধন করেছিলেন এবং কখনও কখনও ধর্মের একটা জাতীয়, প্রায় বাস্তবসম্মত, সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'শক্তিই ধর্ম'। বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, ''আমার ধর্মের সারমর্ম শক্তি। যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তি যোগায় না, তা আমার কাছে কোন ধর্ম নয়, তা উপনিষদ, গীতা বা ভাগবত যাই হোক। ধর্মের চেয়ে শক্তি বড় এবং শক্তির চেয়ে বড় কিছু নয়।''

তিনি প্রকাশ্যে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলেননি :

বিবেকানন্দ ভারতে বিরাজমান অত্যাচারী, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিন্দা করার নেতিবাচক নীতি অনুসরণ করেননি। তবে বীর্য্যের অনুশীলনে ইতিবাচকভাবে জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির পক্ষে কথা বলেননি। দুটি কারণে তিনি তা করতে পারেননি। প্রথমত, তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এবং রাজনৈতিক ও আইনি বিতর্কে জড়াতে চাননি। দ্বিতীয়ত সেই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতে দৃঢ়ভাবে চালকের আসনে বসেছিল। বিবেকানন্দ যদি খোলাখুলিভাবে রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা বলতেন, তবে তিনি কারারুদ্ধ হতেন। এর অর্থ হত তার শক্তি হারিয়ে ফেলা এবং তার অন্তরের সবচেয়ে প্রিয় কাজ—তার দেশের মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় পুনর্জন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যদিও বিবেকানন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনো প্রতিবাদী তত্ত্বকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেননি, তবুও তিনি দরিদ্র ও পীড়িতদের মুক্তির লক্ষ্যে গভীরভাবে নিবেদিত ছিলেন। *(ক্রমশঃ)*

পৌষ সংক্রান্তি

আলপনা ঘোষাল

পৌষসংক্রান্তি বা মকরসংক্রান্তি হল, ভারত উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে উদযাপিত মধ্য শীতকালীন ফসল উৎসব। এটি বাংলা পৌষ মাসের শেষ দিন। বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রতি বছর ১৪ই জানুয়ারি (অধিবর্ষে) বা ১৫ই জানুয়ারি এটি উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে সূর্যের রাশিচক্রে ধনু থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের দিন হিসাবে পালন করা হয়। যেহেতু এই পরিবর্তন সূর্যের দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী যাত্রার সঙ্গে মিলে যায়, তাই উৎসবটি সূর্যকে নিবেদিত এবং একটি নতুন শুরুর প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বহুদিনব্যাপী উৎসব হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটা বাঙালিরা নতুন চাল, খেজুর গুড়, পাটালি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরি করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, পটকা ফাটিয়ে বা ফানুস উড়িয়ে উৎসব পালন করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের কেন্দুলী গ্রামে এই দিনটিকে ঘিরে ঐতিহ্যময় জয়দেব মেলা হয়। বাউল গান এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া এই মেলার অন্যান্য আকর্ষণ গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম, শিশুদের চোখ ধাঁধানো খেলনা ও আকর্ষণীয় পুষ্প সম্ভার। পাশাপাশি রকমারি ভোজ, শিল্পকলা, নাচ সমাজিকীকরণ। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মকরসংক্রান্তি একটি হিন্দু উৎসব এবং এটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—অন্ধ্রপ্রদেশে ও তেলেঙ্গানায় সংক্রান্তি বা পেড্ডা পান্ডুগা, ভোজপুরি আঞ্চলে খিচারি, আসামে মাঘ বিহু, হিমাচলপ্রদেশে মাগি সাঝি, কেরালায় মকরডিলাক্কু, জম্মুতে মাগি সংগ্রান্দ বা উত্তরায়ণ, হরিয়ানায় ও রাজস্থানে সাকরাত, গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে উত্তরায়ণ, উত্তরাখন্ডে ঘুগুটি, বিহারে দই চিড়া, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং পশ্চিমবঙ্গে মকর সংক্রান্তি (যা বাংলার মকরসংক্রান্তি নামে পরিচিত), উত্তরপ্রদেশে খিচারি সংক্রান্তি, উত্তরাখণ্ডে উত্তরায়ণী, নেপালে মাঘে সংক্রান্তি, থাইল্যান্ডে সংএগন, মায়ানমারে থিংজা, কম্বোডিয়ায় মোহন সংক্রান, মিথিলার তিলসাকরাত এবং কাশ্মীরে শিশু সংক্রাথ নামে পরিচিত। আবশ্যিকভাবে দেশ ভেদে এর নামের মতোই উৎসবের ধরনে থাকে পার্থক্য। সংক্রান্তির দিনে সারা ভারত জুড়ে সূর্যদেব, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এটি অশুভ সময়ের শেষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই দিন অনেক ভক্ত গিয়ে পবিত্র নদী বা হ্রদে গিয়ে সূর্যদেবকে প্রার্থনা জানিয়ে পুজো ও স্নান করেন। প্রতি ১২ বছর অন্তর মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে কুম্ভ মেলায় স্নান করেন ভক্তরা, যা বিশ্বের বৃহত্তম তীর্থযাত্রাগুলোর একটি। এতে প্রায় ৬ কোটি থেকে ১০ কোটি মানুষ অংশ নেয়, যা আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রাচীন প্রথা।

এই দিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে, কপিলমুনির আশ্রমকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত দর্শনার্থীদের সমাগম হয় এই মেলায়। পবিত্র সঙ্গমের জলে স্নান করার মাধ্যমে ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, তারা তাদের পাপ ধুয়ে ফেলতে পারেন এবং পরিত্রাণ পেতে পারেন। তাই দিনটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। বছরে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পিঠে পর্বের মধ্যে পৌষ সংক্রান্তি বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পৌষ পার্বণই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন হিন্দুরা এই দিনটিতে পিতৃপুরুষ বা বাস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি তিলের লাড্ডু এবং নতুন ধান থেকে উৎপন্ন চাল ও নতুন খেজুর গুড়ের তৈরি সিন্নি, বিভিন্ন ধরনের পিঠে-পুলি, পায়েস দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন। এই কারণে পৌষ সংক্রান্তির অপর নাম তিলুযা সংক্রান্তি বা পিঠে সংক্রান্তি। এটি প্রাচীন উৎসবের একটি রূপ।

প্রাচীনকাল থেকেই দেবতার পূজায় পিঠের অর্ঘ্যদানের রীতি রয়েছে। আজও পিঠে পার্বণের আকারে বাঙালি তথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত, মধ্যযুগে ধর্ম পূজায় মদ্য-মাংসের সঙ্গে পিঠেও নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হতো। দেবতার পূজায় নিবেদনের জন্য বছরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার পিঠে প্রস্তুত করার বিধান রয়েছে। তবে গ্রীষ্মকালে পিঠে-পুলি রুচিকর নয় বলে, বর্ষা এবং শীতকালেই মূলত এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই উৎসবটি একসময় সারা বাংলা জুড়ে, ব্যাপকভাবে পালিত হতো এবং বর্তমানেও গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যপ্রেমীদের মধ্যে এই উৎসবের জনপ্রিয়তা রয়েছে। ■

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

অমলকান্তি দাশ

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালম ওংকারং মমলেশ্বরম।।
পর্ল্যাং বৈদ্যনাথং ডাকিন্যাং ভীমশংকরম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে।।
বারণাশ্যান্ত বিশ্বেশং তম্বকং গৌতমীতটে।
হিমালয়েতু কেদারং ঘৃষ্ণোশন্ত বিশালকে।।
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি।।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে ভগবান শিব যখন অগ্নিস্তম্ভ (জ্যোতি) হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই শিখার কোন শুরু বা শেষ ছিল না। সেই ঐশ্বরিক আলোর ১২টি স্থায়ী প্রকাশই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ হিসাবে পরিচিত।

যে সব স্থানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, সেই সকল স্থানে ভগবান শিব স্বয়ং দর্শন দিয়েছিলেন। এই জ্যোতির্লিঙ্গগুলো কেবল মন্দির নয়—এগুলো হল কর্ম, সময়, মৃত্যু, মোক্ষ এবং চেতনার শক্তিশালী প্রবেশদ্বার।

১) সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ : দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের প্রথম জ্যোতির্লিঙ্গ হল সোমনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ। গুজরাটের ভেরাভল নামক স্থানে আরব সাগরের তীরে এই সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে চন্দ্রদেব দ্বারা এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

এই মন্দিরকে মোহম্মদ গজনী থেকে শুরু করে বহু মুসলমান শাসক ধ্বংস করলেও মন্দিরটি বারংবার তৈরি হয়। ভারতের স্বাধীনতার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দ্বারা মন্দিরটি বর্তমান রূপ পায় এবং তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রচলিত আছে এই মন্দিরে পূজার্চ্চনা ও দর্শনে ভক্তগণ জন্ম এবং মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পায়।

২) মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ : অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল জেলার নল্লামল্লা জঙ্গলের মধ্যে শ্রীশৈলম পাহাড়ে দ্বাদশ

জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। এখানে ভগবান শিব মল্লিকার্জুন এবং মাতা পার্বতী ভ্রামরাম্বা নামে অবস্থান করছেন। এই মন্দিরটি ৫১ শক্তিপীঠের মধ্যেও একটি শক্তিপীঠ। এখানে মাতা সতীর ঠোঁটের উপরের অংশ পড়েছিল। মল্লিকা অর্থাৎ পার্বতী এবং অর্জুন অর্থাৎ শিব এই নামানুসারে এই মন্দিরের নাম মল্লিকার্জুন হয়। প্রচলিত আছে এই মন্দিরে দর্শন ও পূজা করলে ভক্তদের পাপ নাশ হয়।

৩) মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ : মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ন নগরীতে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের আরেকটি অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। এই জ্যোতির্লিঙ্গটি একমাত্র দক্ষিণ মুখী জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানে ভগবান শিব মহাকাল রূপে বিরাজমান আছেন। মহাকাল হলেন কালেরও প্রভু এমনকি মৃত্যুও যাকে ভয় পায়। প্রচলিত মত অনুসারে এই মন্দিরে পূজা ও দর্শনে ভক্তগণ অকাল মৃত্যু ও ভয় থেকে মুক্তি পায়। এই মন্দিরের ভস্ম আরতি খুবই প্রসিদ্ধ।

৪) ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ : মধ্যপ্রদেশের খান্ডবা জেলার নর্মদা নদীর মাঝখানে শিবপুরি নামক দ্বীপে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ওমকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। এই জ্যোতির্লিঙ্গের আকৃতি ওমের মতো।

প্রচলিত মত অনুসারে এই মন্দিরে দর্শন ও পূজনে ভক্তগণ সবরকম কষ্ট থেকে মুক্তি পায়।

৫) কেদারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ : উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগ জেলার হিমালয়ের কোলে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধের পর বিজয়ী পান্ডবগণ যুদ্ধে তাদের দ্বারা নিহত মানুষদের হত্যার পাপ থেকে ক্ষমা চাইতে এই মন্দিরে গিয়েছিলেন।

কিংবদন্তী অনুসারে এই জ্যোতির্লিঙ্গ তপস্যা ত্যাগ এবং মুক্তির পথ দেখায়।

৬) ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ : মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার সেহাদ্রী পর্বতমালায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের আরেকটি জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে কুম্ভকর্ণের পুত্র রাক্ষস ভীম বরদান পেয়ে যখন দেবতাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তখন দেবতাদের প্রার্থনায় দেবাদিদেব মহাদেব এই স্থানে রাক্ষস ভীমকে বধ করেন এবং ভীমশঙ্কর জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে অধিষ্ঠিত হন। এই জ্যোতির্লিঙ্গের আকার বড় এবং মোটা হওয়ায় মোটেশ্বর মহাদেব নামেও পরিচিত। এই জ্যোতির্লিঙ্গ ধর্মের সুরক্ষা এবং অধর্মের বিনাশের প্রতীক।

৭) কাশী বিশ্বনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ : উত্তরপ্রদেশের বারাণসী নগরীতে পবিত্র গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কাশী বিশ্বনাথ মন্দির অবস্থিত। পৌরাণিক মত অনুসারে বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীনতম শহর হল কাশী। এই শহর ভগবান শিব এবং মাতা পার্বতীর আদি বাসস্থান। বিশ্বের নাথ অর্থাৎ বিশ্বনাথ রূপে ভগবান শিব এখানে পূজিত হন। পাশেই আছে মা অন্নপূর্ণার ভব্য মন্দির। এই মন্দিরও মুসলমান দ্বারা অনেকবার আক্রান্ত হয়। কথিত আছে এই মন্দিরে দর্শন ও পূজনে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৮) ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ : মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার ত্র্যম্বক গ্রামে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে ঋষি গৌতমের তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান শিব এখানে দর্শন দিয়েছিলেন। এখানে শিব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা একসাথে পূজিত হন। এই শিবলিঙ্গের তিনটি মুখ। মান্যতা আছে এখানে পূজার্চ্চনা ও দর্শনে কালসর্প দোষ এবং পিতৃ দোষ নিবারণ হয়।

৯) বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ : ঝাড়খন্ড রাজ্যের দেওঘর জেলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের আরেকটি অন্যতম এই বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে লঙ্কাপতি রাবণের কঠোর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান শিব দর্শন দিয়েছিলেন। রাবণ শিবলিঙ্গকে লঙ্কায় না নিয়ে যেতে পারলে এই শিবলিঙ্গ এই স্থানেই স্থাপিত হন।

এখানে ভগবান শিব বৈদ্য অর্থাৎ ডাক্তার রূপে পূজিত হন। তাই এই জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গ নামে পরিচিত। এই স্থানটি ৫১ শক্তিপীঠেরও একটি শক্তিপীঠ, এখানে মা সতীর হৃদয় পড়েছিল। প্রচলিত মত অনুসারে এই জ্যোতির্লিঙ্গ ভক্তদের রোগ নিরাময় ও দীর্ঘায়ু প্রদান করেন।

১০) নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ : গুজরাটের দ্বারকার পাশে দারুকাবনে গোমতী নদী ও ভ্যাট দ্বারকার মধ্যে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। যেখানে ভগবান শিব নাগের দেবতা রূপে পূজিত

হন। পৌরাণিক কথা অনুসারে ভগবান শিবের ভক্ত সুপ্রিয়া রাক্ষস দ্বারা বন্দী হলে মহাদেব রাক্ষসদের বধ করেন ও সকল বন্দিদের মুক্ত করেন। ভক্ত সুপ্রিয়ার আগ্রহে দেবাদিদেব মহাদেব এখানে নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে অধিষ্ঠিত হন। প্রচলিত আছে এই স্থান ভক্তদের বিষ, ভয় এবং নেতিবাচক শক্তি থেকে রক্ষা করে।

১১) রামেশ্বরম জ্যোতির্লিঙ্গ : তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরম জেলায় দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম রামেশ্বরম জ্যোতির্লিঙ্গ অবস্থিত। পৌরাণিক কথা অনুসারে রাবণ বধের পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ থেকে মুক্তি পেতে এখানে পূজা করেন। এই পবিত্র স্থানটি চারধামের মধ্যেও একটি অন্যতম স্থান। কিংবদন্তী আছে রামেশ্বরমে যে ২২টি পবিত্র কুন্ড আছে, তাতে স্নান করলে ভক্তগণ পাপ মুক্ত হয়। এই স্থান আত্মশুদ্ধি ও ভক্তির সর্বোচ্চ স্থান।

১২) ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ : মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের পাশে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্তিম জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির অবস্থিত। এই জ্যোতির্লিঙ্গ ঘুশ্মেশ্বর নামেও পরিচিত। এই মন্দিরটিকেও আক্রমণ- কারীরা নষ্ট করলে ১৬শ শতাব্দীতে শিবাজী মহারাজের দাদু মৌলজী ভৌসলে এবং পরে ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ হোলকর পুনরায় নির্মাণ করান।

এই মন্দিরের জ্যোতির্লিঙ্গ পূর্বমুখী। পৌরাণিক কথা অনুসারে ভগবান শিবের ভক্ত ঘুশ্মা এখানে কঠোর তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করেন এবং তার মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করেন, তখন ভগবান শিব এই স্থানে ঘুশ্মেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নামে অধিষ্ঠিত হন।

জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন কেবল একটি তীর্থযাত্রা নয়, এটি আত্মার একটি যাত্রা। শিব পুরাণ অনুসারে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে ভক্তদের পাপ নষ্ট হয়, মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে এবং জীবন আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তিতে ভরে ওঠে। **হর হর মহাদেব।** ■

শোকবার্তা

মেদিনীপুর জেলার রাধামোহনপুর গ্রামের প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী গত ১১/১২/২৫ তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। উনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রথম প্রখণ্ড সভাপতি (১৯৯১ , ১৯৯৩) ছিলেন এবং তার আগে ভারতীয় মজদুর সংঘের খড়্গপুর জোন সম্পাদক ছিলেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা রেখে গেছেন। ওঁনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি।

...

গত ৩১শে ডিসেম্বর ভোরবেলায় দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের গোরক্ষা প্রমুখ শ্রীবিজয় সাউয়ের পুজ্য মাতা পরলোক গমন করেছেন। পরমাত্মার কাছে ওঁনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। ওঁম শান্তি, ওঁম শান্তি।

...

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা, বর্তমানে কলকাতা ক্ষেত্রের গোসংরক্ষণ, গোসমবর্ধন প্রমুখ শ্রীঅমল চক্রবর্তীর বাবা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত ৩১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল ৮ ঘটিকায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ১ কন্যা, নাতিপুতি, ভক্ত-শিষ্য সহ অনেককে রেখে যান। অমলদা পিতার সেজ সন্তান। মৃত্যুর খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় সহ সংগঠনমন্ত্রী শ্রীবিনায়ক দেশপ পান্ডে, ক্ষেত্র সংঠন মন্ত্রী শ্রীসোহনজী সোলঙ্কি, প্রান্ত সগঠন মন্ত্রী শ্রীমানিক পাল ও প্রান্তমন্ত্রী চন্দ্রনাথ দাস উনার বাড়িতে যান ও সমবেদনা জানান। রবিবার ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ শ্রীগৌতম সরকার সহ প্রান্ত কার্যালয় থেকে কয়েকজন বাড়ি গিয়ে দেখা করেন। বিশ্ব হিন্দু বার্তা পরিবার তাদের পরিবারকে সমবেদনা জানায়।

হিন্দু জীবনে মন্দির-মঠ ও অর্চক পুরোহিতের ভূমিকা

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মন্দিরই সমাজের মুখ্য কেন্দ্র ছিল। ভারতবর্ষকে সোনে কি চিড়িয়া বলা হতো। বাস্তবে ভারতবর্ষের সম্পন্নতা এবং সমৃদ্ধি মন্দিরের কারণেই ছিল। সমাজের উত্তম সঞ্চালয়ের কেন্দ্র মন্দিরই ছিল। মন্দির দ্বারা পঞ্চশালার সঞ্চালন হতো। যেমন—

১) বেদশালা : অর্থাৎ শিক্ষাদানের কেন্দ্র বা গুরুকুলের পরিচালনা মন্দির ভিত্তিক ছিল।

২) বৈদ্যশালা : অর্থাৎ মন্দিরের পূজারী চরণামৃত, পঞ্চামৃত এবং প্রসাদের মাধ্যমে ঔষধি প্রদান করতেন। এছাড়া ব্রত, উপবাস এবং ঋতু অনুসারে খাদ্য গ্রহণ বা ত্যাগ করার পরামর্শ দিতেন। বিশুদ্ধ জীবনশৈলীর জ্ঞান দিতেন, ফলে মানুষের আরোগ্য থাকার পথনির্দেশ পাওয়া যেত।

৩) গো-শালা : অর্থাৎ, গো-পালন এবং সংবর্ধন করার প্রয়োজনীয়তা শেখানো হতো। শুদ্ধ দুধ থেকে ঘি, মাখন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎপাদন করা হতো। এছাড়া গোবর এবং গোমূত্র থেকে কিভাবে গৃহের শুদ্ধতা বজায় রাখা ও রোজগারের মাধ্যম হতে পারে, তা বোঝানো হতো।

৪) সংগীতশালা : অর্থাৎ মানব জীবনে সংগীতের প্রভাব এবং গায়ন বিদ্যা শেখানো হতো। মানুষের জীবনে গান, বাজনার প্রভাব ও তার উপকার সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হতো। সংগীত জ্ঞান বা তার প্রতি রুচি মানুষের জীবনে সম্পূর্ণতা আনে।

৫) মল্লশালা : অর্থাৎ শারীরিক শক্তির বিকাশ, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। ফলে সমাজে বীরত্বের বিকাশ হতো। প্রয়োজনে সমাজ যে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পিছপা হতো না।

শিবাজীর গুরু রামদাসজি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আখড়ার নির্মাণ করেছিলেন, যা পরে শিবাজীর স্বরাজ স্থাপনে খুবই সাহায্য করেছিল। মন্দির থেকে ধর্মাচরণের উপদেশ এবং সামাজিক প্রবোধনের কাজ করা হতো। মন্দির দ্বারা সমাজের উত্তম প্রবন্ধন এবং সামাজিক অনুশাসনের মহান কাজ হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছিল। অর্থাৎ মন্দির কেবল পূজাপাঠের কেন্দ্রই ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সুরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্র ছিল। এই কারণেই মুঘল কালে ৩৫০০ এর বেশি শক্তি কেন্দ্র অর্থাৎ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। তখন সমাজের মানুষ মন্দির বাঁচানোর জন্য আক্রমণকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ করেছিল এবং প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত দিতে পিছপা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে মাহসুদ গজনী যখন সোমনাথ মন্দিরের ওপর আক্রমণ করে, তখন চালুক্য সেনার সঙ্গে ৫০০০ শিবভক্ত মানুষ অংশগ্রহণ করে জীবন বলিদান দেন।

১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের সেনাপতি মীরবাকী যখন অযোধ্যা ধামের শ্রীরাম জন্মভূমির উপর আক্রমণ করে, তখন ১৫ দিন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৬ হাজার শ্রীরাম ভক্তরা প্রতিকার করে বলিদান দেন। তারপর দীর্ঘ বছর ৪৯০ বছর ধরে হিন্দু সমাজ সংঘর্ষ চালিয়ে যায়, যতদিন না বাবরি ধাঁচা ধ্বংস করে শ্রীরাম লালা তার জন্মস্থানে বিরাজমান হন। কারণ মন্দিরই এই দেশের শক্তি কেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র। আজও কোন মানুষকে মন্দির দর্শন করার জন্য বা পূজা করার জন্য নিমন্ত্রণ দিতে হয় না। সম্পূর্ণ ভারতীয় সমাজ শ্রদ্ধা এবং ভক্তিভরে লাখ লাখ মানুষ মন্দির দর্শন হেতু যাত্রা করে থাকেন। এইটিই মন্দির ব্যবস্থার বিশেষত্ব।

১) মন্দিরের আধারস্তম্ভ : ব্যবস্থা, পূজা, ভক্তি এবং শ্রদ্ধালু সমাজ, এই চারটি মন্দিরের আধারস্তম্ভ। আবার মন্দির, ন্যাসী বা ট্রাস্টি, পূজারী, ভক্ত ও শ্রদ্ধালু সমাজ, এই পাঁচটির পরস্পরের পূরক ব্যবহারই সম্পূর্ণ সমাজকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মার্গ দর্শন করতে পারে। ব্যবস্থা অর্থাৎ ন্যাসীমণ্ডলী বা ট্রাস্টিস, পুজো অর্থাৎ পূজারী, ভক্তি অর্থাৎ মন্দিরে নিয়মিত দর্শন হেতু আসা ভক্ত এবং শ্রদ্ধালু অর্থাৎ বড়ো সমারোহে লাখে লাখে মানুষের সম্মিলিত হওয়ার শ্রদ্ধাবান সমাজ—এই চার স্তম্ভের উপরেই মন্দিরের ভীত মজবুত হয়। মন্দিরে বিরাজমান দেব-দেবীর বিগ্রহ মন্দিরের আত্মা এবং পূজারী মন্দিরের প্রাণ হয়ে থাকেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদে, মন্দির অর্চক পুরোহিত এই আয়াম ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। মন্দির সম্পূর্ণ সমাজকে একসঙ্গে

জুড়ে রাখার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মন্দিরে অর্পণ করা ধন-সম্পত্তির উপযোগ সেবা বস্তির মাধ্যমে সেবা প্রকল্প চালানোর জন্য হোক এটি পূজনীয় গুরুজীর ইচ্ছে ছিল। বর্তমান সময়ে মন্দির হিন্দু সমাজের শক্তি কেন্দ্র হয়ে সমাজকে ধর্মাচরণ এবং ধর্ম স্বাভিমান জাগানোর কাজে অগ্রণী হয়, এইটি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রয়াস।

২) মন্দির সম্পন্নতার প্রতীক : সনাতন হিন্দু ধর্মে দান করাকে বিশেষ গুরুত্ব ও মহত্ত্বের বিষয় বলা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ক্ষমতা অনুসারে দান করা উচিত। এই কারণে প্রত্যেক মন্দিরে দানপাত্র বা দানবাক্স রাখা থাকে। মন্দিরে গিয়ে ভগবানের সামনে দান করা উচিত। প্রচলিত আছে মন্দিরে দান করলে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁর দৃষ্টি দ্বারা ভক্তকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। ঈশ্বরের কাছে নিজের প্রিয় বস্তু দান করার পরম্পরা আছে। সাধারণত সবার কাছেই ধন বা টাকা অধিক প্রিয়, তাই মন্দিরে ধন দানই অধিক মহত্বপূর্ণ। আমাদের অর্পণ করা ধন দ্বারা মন্দিরের সম্পন্নতা বাড়ে, যা খুবই আনন্দের বিষয়। কারণ আমাদের মন্দির সম্পন্নতার প্রতীক হওয়া উচিত। পূজারীদের দ্বারা মন্দিরে আগত ভক্তদের সূচি বানিয়ে, সেই ভক্তদের পরিবারে সংস্কার ও জাগরণের উপক্রম শুরু করা উচিত।

৩) ন্যাসী বা ট্রাস্টিদের ভূমিকা : যে কোনও মন্দিরের ন্যাসী বা ট্রাস্টি হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। মন্দিরের ন্যাসী ভগবানের অধিক বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে মানা হয়। সমাজে অনেক বড় বড় সংস্থা আছে, কিন্তু মন্দিরের ট্রাস্টি অধিক ভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই হয়ে থাকেন। কারণ নিজে পুরুষার্থ সম্পন্ন হয়ে বড় বড় সংস্থা দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু কোন দেবালয়ে ট্রাস্টি হওয়ার জন্য পূর্ব অর্জিত পুণ্যের পুঁজি লাগে। যে মহানুভব ঈশ্বরের কৃপাতে ট্রাস্টি হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের অধিকতম সময় মন্দিরে দেওয়া উচিত। ঘর-গৃহস্থলী থেকে ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে মন বাড়ানো উচিত। মন্দিরের বিকাশ এবং মন্দিরকে সমাজের অভিমুখী বানানোর জন্য সব সময় চিন্তা করা উচিত। অধিক থেকে অধিক নাম স্মরণ করে স্বয়ং এর আধ্যাত্মিক বিকাশ করা উচিত। আমাদের মন্দির সম্পূর্ণ সমাজের কেন্দ্র যেন হয়, সেই হেতু যোজনা তৈরি করে সন্ত মাহাত্মাদের এবং জ্যেষ্ঠ মহানুভবের আশীর্বাদ এবং মার্গদর্শন নেওয়া উচিত। মন্দিরের ট্রাস্টিদেরও ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত।

৪) মন্দিরে পূজারীর ভূমিকা : পূজারী মন্দিরের কর্মচারী নন, বাস্তবে পূজারীকে মন্দিরের প্রাণ বলা হয়। কথায় আছে , 'অর্চকস্য প্রভাবেনঃ শিলা ভবতিঃ শংকরঃ' অর্থাৎ পূজারীর ভাবাপূর্ণ পূজার প্রভাবে পাষাণের মধ্যে দেবত্ব আসে। দেব-দেবীর বিগ্রহে বিধি অনুযায়ী প্রাণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিগ্রহের মধ্যে যে দেবত্ব আসে, তাকে আরও অধিক তেজস্বী বানানোর সামর্থ্য পূজার মাধ্যমেই হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণ ভাবাপূর্ণভাবে পুজো করা, মন্দিরের অনুশাসনের সংবর্ধন হেতু আগত শ্রদ্ধালুদের মনোভাব সকারাত্মক থাকে, এই ধরনের মানসিকতা রাখাই অর্চক পূজারীদের মহত্ত্বপূর্ণ কাজ। যে দেবালয়ে নিত্য ভাবপূর্ণ পূজা, আরতি, উপাসনা, নাম স্মরণ এবং নিত্য জ্ঞান-যজ্ঞ হয় সেই মন্দির জাগ্রত হয়। যে স্থানে ঈশ্বরকে মানুষের মতো সুবিধা প্রদান করা হয়, যেমন—সেখানে স্নানের জন্য কালানুরূপ গরম বা ঠান্ডা জল, ভগবানের বস্ত্র পরিবর্তন, নিত্য নিয়মিত নৈবেদ্য প্রদান, বিশ্রামাদি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে, সেখানে ঈশ্বরও জীবাত্মার সুবিধার খেয়াল রাখেন। আগত শ্রদ্ধালু মন্দিরে অনুশাসনকে শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করেন অর্থাৎ সমাজকে স্বাভাবিকভাবে নিয়ম পালন, সময় পালন করার সংস্কার মন্দির থেকে প্রাপ্ত হয়।

যেখানে পূজারী ভক্তদের সঙ্গে নিয়মিত কথোপকথন করেন, সেখানে ভক্তদের সংখ্যা বাড়ে। যখন পূজারী ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন, তখন ভক্তদের মনে হয় যেন তারা ভগবানের সঙ্গে কথা বলছেন এবং ভক্তদের মনে হয় যেন তারা ভগবানের সঙ্গে আলাপচারিতা করে যেন তারা মানসিক সমস্যার সমাধান পান। ভক্তরা পূজারীর দ্বারা কথিত বাক্যকে গ্রহণ করে থাকেন অর্থাৎ পূজারী যদি বলেন, 'আপনি তো সংস্কারি তাই নিয়মিত মন্দিরে দর্শনের জন্য আসেন। কিন্তু আপনার পরিবারে অন্য সদস্যদেরকে সংস্কার কে দেবে? ওদেরকেও সপ্তাহে একবার মন্দির দর্শন করার জন্য আনা দরকার'। অধিকাংশ ভক্ত পূজারীর কথা অনুসারে বাড়ির অন্য সদস্যদের মন্দিরে নিয়ে আসবেন, এর ফলে মন্দিরের দর্শন হেতু হিন্দু শ্রদ্ধালুদের সংখ্যা বাড়বে।

৫) বৈদ্য পূজারী : প্রাচীনকালে পূজারীদের আয়ুর্বেদের জ্ঞান থাকতো, মন্দির পরিসরে ভগবানের কীর্তনাদি হত, ভক্তদের গলার স্বর শুনে পূজারী তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুঝতে পারতেন। সবাইকে তীর্থ প্রসাদ

বিতরণ করা হতো, সেখানে রীতি অনুসারে বিভিন্ন চূর্ণ, কাঢ়া, চরণামৃত, পঞ্চামৃত গ্রহণ করার ফলে ছোটখাটো অসুখ ঠিক হতো। এই কারণে মন্দিরে প্রসাদ দেওয়ার পদ্ধতি আছে। অনেক পূজারী নাড়ী পরীক্ষা করে কফ, বাত, পিত্ত নিবারণ করার উপায় বলে দিতে পারতেন। এইভাবে মন্দিরের ভাবমণ্ডল ভালো রাখা দরকার। সমাজে মন্দিরের অনুশাসনকে অবগত করানো, মন্দিরে আগত ভক্তদের সূচি বানিয়ে ভক্তদের পরিবারে সংস্কার ও জাগরণের উপক্রম শুরু করা উচিত, যাতে ভক্তদের মনে হিন্দুধর্ম আচরণ ও হিন্দুধর্ম স্বাভিমান প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। সপ্তাহে দু-তিন ঘন্টা সময় বের করে ভক্তদের পরিবারের শিশুদের আরতির বিবিধ স্ত্রোত্র মুখস্থ করানো এবং মন্দিরে আসার জন্য যথাসম্ভব প্রয়াস করার প্রয়োজন। এই ধরনের প্রয়াস অর্চক পূজারীদের দ্বারা নিয়মিত করানো গেলে, একসময় চার্চ, মসজিদের মতনই মন্দির সমাজের শক্তিকেন্দ্র রূপে তৈরি হয়ে যাবে।

৬) ভক্তদের ভূমিকা : যাদের জীবনে নিত্য উপাসনার অধিষ্ঠান আছে এবং যারা ভগবানের থেকে কখনোই বিভক্ত হন না, তাদেরই ভক্ত বলা হয়। প্রতিদিন মন্দির দর্শন হেতু যাওয়া একটি শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যেমন—একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, সোমবার, শনিবার আদি তিথিতে মন্দির দর্শন করা একটি পুণ্যের কাজ। জীবনের ছোট ছোট ব্যবহারিক বিষয়ে নিয়ম মেনে জাগরণ, নিদ্রা, ভোজন ইত্যাদি কর্ম নিয়মিত সঠিক সময়ে করা, সময়ের গুরুত্ব বুঝে সময়ের সম্মান করা ভক্তিরই রূপ। নিজের পরিবারের লোক মন্দির দর্শন করতে যান এমন প্রয়াস করা, নিজে সংস্কারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদেরও সংস্কার দেওয়া। ভক্তির মার্গ প্রশ্বস্ত করার জন্য ভক্তদের নিজের মতনই নতুন নতুন ভক্ত তৈরি করার প্রয়াস করা উচিত। কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন, কোন না কোন নতুন ব্যক্তিকে মন্দিরে নিয়ে আসা উচিত। এই প্রয়াসের ফলে মন্দিরের খ্যাতি বাড়ে এবং সমাজে সংস্কারী মানুষের সংখ্যা বাড়ে।

৭) শ্রদ্ধালু সমাজ, একটি বিরাট ধর্মশক্তি : ভারতবর্ষের ৫৫% হিন্দু সমাজ তীর্থটান অর্থাৎ তীর্থযাত্রা করেন। এই কারণে ভারতের জি.ডি.পি এবং রিলিজিয়াস ইকোনমির উপর তীর্থযাত্রার বড় প্রভাব আছে। আমাদের ধর্ম এবং ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। তাই মহত্ত্বপূর্ণ তিথিতে, বার্ষিক মহাপর্বে তীর্থযাত্রা করে থাকে মানুষ। নিজের জীবনে গঙ্গাসাগর যাত্রা, চারধাম যাত্রা, সপ্তপুরী, অষ্টবিনায়ক, দ্বাদশ জ্যোতির লিঙ্গ, ৫১ শক্তি পীঠ ইত্যাদি পবিত্র স্থানের দর্শনলাভের প্রবল ইচ্ছা থাকে প্রায় সকলেরই। এই কারণে ভারতবর্ষকে দেবতার দেশ মানা হয়ে থাকে। এই ধরনের ভক্তদের জন্যই ভগবান স্বয়ং ভারতবর্ষে অবতার রূপে জন্ম নিয়ে থাকেন। অন্যান্য দেশে, ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের পাঠান। কুম্ভ মেলায় কোটি কোটি মানুষের সমাগম হয়, যার জন্য কোন নিমন্ত্রণ দিতে হয় না। ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ এবং সব সম্প্রদায় মানুষ কুম্ভ মেলা স্নান করে পুর্ণ অর্জন করেন, যা আমাদের সনাতন সভ্যতার বিরাট দর্শন বলেই ভাবা উচিত।

৮) বর্তমান মন্দিরের স্থিতি এবং উপায় যোজনা : বর্তমানে দেশে গড়ে ১ লক্ষ জনসংখ্যায়, প্রায় ৫৪টি মন্দির আছে। এর মধ্যে সাধারণত সার্বজনীন, ব্যক্তিগত, আখড়া দ্বারা সঞ্চালিত, পুরাতত্ত্ব বিভাগ দ্বারা সঞ্চালিত এবং সরকারের দ্বারা সঞ্চালিত মন্দির আছে। মন্দির প্রবন্ধন কিংবা ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন সমানতা নেই। বর্তমানে দেশে মন্দির সম্পর্কিত ত্রিশটির বেশি পৃথক পৃথক আইন আছে। বেশিরভাগ মন্দিরই অনেক সমস্যা দ্বারা জর্জরিত। বেশিরভাগ মন্দিরই ট্রাস্টের অন্তর্গত বিবাদের কারণে প্রভাবিত হচ্ছে। আবার কোথাও ট্রাস্ট ও পূজারীদের মধ্যে বিবাদ ইত্যাদি কারণে মন্দিরের জমি-জায়গা, সম্পত্তি বেআইনিভাবে মানুষ দখল করে রেখেছে। বড় বড় প্রাচীন মন্দির ও সম্পন্ন মন্দির সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে। এই ধরনের মন্দিরের শ্রদ্ধালুদের দ্বারা প্রদত্ত ধন-সম্পত্তি সরকার দ্বারা অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা থেকে মন্দিরকে মুক্ত করা আবশ্যক হয়েছে।

৯) উপায় যোজনা :

ক) মন্দিরের ন্যাসী বা ট্রাস্টিদের এবং পূজারীদের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্ক স্থাপন করা।

খ) মন্দিরের শ্রেণি অনুসারে সূচি বানিয়ে জেলা অনুসারে ট্রাস্টিদের সম্মেলন করা।

গ) মন্দিরের ট্রাস্টিদের কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণবর্গের আয়োজন করা।

ঘ) পূজারী অর্চকদের প্রশিক্ষণবর্গের ব্যবস্থা করা।

ঙ) জেলা স্তরে মন্দির সমন্বয় সমিতি গঠন করে, মন্দিরগুলোর পারস্পরিক সমন্বয় যাতে হয় এমন কার্যক্রমের আয়োজন করা।

চ) বড় বড় অধিক সম্পন্ন মন্দিরগুলোর দ্বারা ছোট ছোট মন্দির দত্তক নেওয়ার যোজনা তৈরি করা, যাতে তারা সেই ছোট মন্দিরকে কয়েক বছরের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে পারে।

ছ) মন্দিরের পর্যাবরণ ও পঞ্চ মহাভূতের সংরক্ষণ কেন্দ্র যেন তৈরি হয়।

জ) মন্দির পরিসরে বড় বৃক্ষ এবং সুগন্ধি পুষ্পের গাছ যেন লাগানো হয়।

ঝ) স্থায়ী জলাশয় এবং অর্ঘ্যদানের ব্যবস্থা যেন হয়।

ঞ) গো-সংরক্ষণ, গো-সংবর্ধন ও গো-পূজার জন্য কমপক্ষে একটি গাভী থাকা দরকার প্রতিটি মন্দিরে এবং পুজোর জন্য কেবলমাত্র শুদ্ধ দুধ ও ঘি যেন ব্যবহার করা হয়।

ট) মন্দিরে অগ্নি কর্ম হেতু যজ্ঞশালা, হোম হবনের ব্যবস্থা যেন থাকে।

১০) মন্দির অধ্যাবত কেন্দ্র : প্রান্তে একটি অধ্যায়ন মন্দির ও একটি অধ্যায়ন কেন্দ্র থাকা উচিত, যেখানে প্রাচীন প্রচলিত ভাষায় মন্দির সম্পর্কিত গ্রন্থ উপলব্ধ যেন হয়।

১১) মন্দির সংশোধন সাহিত্য : গ্রন্থ, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি অধ্যাবতের সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা যেন উপলব্ধ থাকে। *(ক্রমশঃ)*

নেশামুক্তি অভিযান, ব্রহ্মপুর, মধ্যবঙ্গ

প্রতিবাদ সভা, গঙ্গাসাগর, দক্ষিণবঙ্গ

আমতা শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা আইআইটি খড়্গপুরে শিক্ষাগত ভ্রমণ

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জনস্বাস্থ্যের রক্ষাকবজ : আয়ুর্বেদ ও যোগ

অধ্যাপক দেবাশিষ চট্টোপাধ্যায়

সারাংশ : আধুনিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল সংক্রামক রোগের অব্যাহত উপস্থিতি এবং জীবনধারাভিত্তিক দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগের (NCDs) দ্রুত বিস্তার। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই দ্বিমুখী চাপ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আরও প্রকট। উচ্চ ব্যয়, প্রযুক্তি নির্ভরতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সকলের কাছে সমানভাবে সহজলভ্য নয়। এই প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেধ ও যোগভিত্তিক স্বাস্থ্যচর্চা একটি কম-ব্যয়ী, প্রতিরোধমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদে টেঁকসই বিকল্প হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সামগ্রিক স্বাস্থ্য ধারণার সঙ্গে আয়ুর্বেদ ও যোগ গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Covid-19 অতিমারির অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে ভারতীয় পরম্পরাগত চিকিৎসা ব্যবস্থা রোগপ্রতিরোধ, মানসিক স্থিতি ও জীবনশৈলী ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি, আয়ুষ মিশন এবং পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য কাঠামোর আলোকে আয়ুর্বেধ ও যোগের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা এবং সাধারণ ভারতীয় জনগণের দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ উপস্থাপন করা।

★ **ভূমিকা** : জনস্বাস্থ্য একদিকে আন্তর্জাতিক বাস্তবতা, অন্যদিকে জাতীয় ও স্থানীয় নীতিনির্ধারণের ফলাফল। বৈশ্বিকায়ন, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও মহামারির ফলে স্বাস্থ্য আজ আর কোন দেশের একক বিষয় নয়। একই সঙ্গে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও নীতিগত হস্তক্ষেপ থাকলে বহু জনস্বাস্থ্য-সংকট কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব।

ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থা বর্তমানে একটি দ্বৈত চাপে অবস্থান করছে—একদিকে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর মতো সংক্রামক রোগ এবং অন্যদিকে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্থূলতা ও মানসিক অসুস্থতার মতো দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ। এই রোগসমূহ কেবল শহরকেন্দ্রিক নয়; গ্রামীণ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতেও এগুলো গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করছে।

★ **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য ধারণা :** WHO স্বাস্থ্যকে সংজ্ঞায়িত করেছে—

"স্বাস্থ্য হল শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার পূর্ণ অবস্থা—কেবল রোগ বা অক্ষমতার অনুপস্থিতি নয়।"

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কেবল চিকিৎসা নয়, প্রতিরোধ, জীবনশৈলী পরিবর্তন ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করাই স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। আয়ুর্বেধ ও যোগ এই সামগ্রিক ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

★ **আয়ুষ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি :** ২০১৪ সালের ৯ নভেম্বর আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠা ভারতের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তন করে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি (২০১৭)-তে আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথিকে মূলধারার স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

Covid-19 অতিমারির সময় আয়ুষ-৬৪, সংশমনী বটি, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ ও হলুদের মতো ভেষজ উপাদান রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। একাধিক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে এই চিকিৎসার ফলে Covid রোগীদের ক্ষেত্রে CRP–Procalcitonin ও D-Dimer-এর মাত্রা হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

★ **আয়ুর্বেদ : জীবনের বিজ্ঞান :** আয়ুর্বেধ অর্থই হল 'জীবনের বিজ্ঞান'। ত্রিদোষ তত্ত্ব—বায়ু, পিত্ত ও কফ—এর ভারসাম্যের উপর মানবস্বাস্থ্য নির্ভরশীল। আয়ুর্বেদের মতে রোগ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং দীর্ঘদিনের খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ ও জীবনশৈলীর অসামঞ্জস্যের ফল।

আয়ুর্বেধ 'জীবনের বিজ্ঞান'। ভারতের পরম্পরাগত এবং ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি। যেখানে ত্রিদোষ তত্ত্ব (বায়ু, পিত্ত, কফ) অনুযায়ী স্বাস্থ্যকে ভারসাম্যের ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ। 'বায়ু বায়ুবলং বায়ুবায়ুধাতা শরীরিণাম্' (চরক)-বায়ু আমাদের আত্মা স্বরূপ, বলস্বরূপ ও পরিচালনকর্তা। 'পঞ্চধা প্রবিভক্তিং শরীরাং ধারয়তি' (সুশ্রুত)-বায়ু পঞ্চভাবে বিভক্ত হয়ে শরীরকে ধারণ করে আছে। 'পিত্ত শরীরারম্ভক তেজ্ : প্রদান পঞ্চভূত'—দেহসহ শরীর গঠনকারী অগ্নিরসই পিত্ত

নামে অভিহিত। 'দর্শনং শক্তিরুষমা চ।' ক্ষুৎতৃষ্ণা দেহমাদবং প্রভা প্রসাদো মেধা পিত্তকর্মাহবিকারজম' (চড়ক)-দৃষ্টিশক্তি বিধান, শারীরিক বল বিধান, শরীরের তাপরক্ষা, ক্ষুধার-তৃষ্ণা জাগ্রত করা, দেহের মৃদুতা সম্পাদন, দেহের দীপ্তি রক্ষা, মেধা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, বিশুদ্ধ পিত্তের করনীয় কাজ। রসপ্রধান পঞ্চভূতের সারভাগই শ্লেষ্মা। রক্তবাহী ধমনীর পাশে পাশেই আরো যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর ধমনী আছে যারা রক্তের সার ধাতুকে বহন করে।

★ দৈনন্দিন জীবনে আয়ুর্বেদের প্রয়োগ :

- ☛ ডায়াবেটিস (প্রাথমিক পর্যায়) : মেথি ভেজানো জল, আমলকি রস
- ☛ হজম সমস্যা : ত্রিফলা চূর্ণ, জিরা, ধনে, মৌরি
- ☛ সর্দি-কাশি : তুলসী, বাসক পাতা, মধু
- ☛ মানসিক চাপ ও অনিদ্রা : অশ্বগন্ধা
- ☛ বাত ও সন্ধিবাত : নারায়ণ তেল মালিশ

এই চিকিৎসাগুলি কম-ব্যয়ী ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য, যা গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য উপযোগী।

★ যোগ : মানসিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়ন্ত্রণ

যোগ একটি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন পদ্ধতি। পতঞ্জলি যোগসূত্র অনুযায়ী—'চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ'। যোগ স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃস্রাবী ব্যবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যোগ স্বাস্থ্যের ভারসাম্য এবং সমন্বয় সাধন করে। যোগ শব্দের অর্থ হল-জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার (যোগ) মিলন। আত্মস্বরূপ আস্বাদন । সাধন ও সাধনার মাধ্যমের নামই যোগ।

ভারতীয় দর্শন মতে যোগশাস্ত্র দুটি ধারায় বিভক্ত। রাজযোগ ও হঠযোগ। পতঞ্জলি দর্শনে বলা হয়েছে রাজযোগ চারটি ভাগে বিভক্ত—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। চিত্তবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা। মন বুদ্ধি স্থির হয় এবং আত্ম সাক্ষাৎকার যোগ। সমাধিপাদে সমাধি লাভ করতে এবং বাধা বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম বিবরণ পাওয়া যায়। সাধনপাদে পাই আমরা সাধনার বিবরণ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান সাধনা অঙ্গ। জ্ঞানসাগর থেকে পাড়ি দিয়ে অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করার প্রণালী হল বিভূতিপাত। এরা সাধারণত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন সাগরের সঠিক সন্ধান দিতে পারে। বুদ্ধি ও মনকে জয় করে আত্ম স্বরূপ উপলব্ধিকেই কৈবল্যবাদ বলে। এর উল্লেখ সাংখ্য, যোগ এবং কৈবল্য উপনিষদে পাওয়া যায়। যা মোক্ষ প্রাপ্তি বোঝায়। জীবাত্মাকে পরমাত্মার (শিব/ব্রহ্ম) সঙ্গে একীভূত করে। দুঃখে নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ। মহাযোগীরা বিভূতি বাদ ও কৈবল্যবাদের যোগ মার্গের নিপুণতা অর্জন করেন। হঠযোগে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে দেহশুদ্ধির ওপর। শরীরই সাধনার ভিত্তি ভূমি। হঠযোগের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের মিলন ও সহবাস ইত্যাদির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

★ সাধারণ মানুষের জন্য যোগাভ্যাস

- ☛ উচ্চ রক্তচাপ : অনুলোম,বিলোম, ভ্রমরি
- ☛ ডায়াবেটিস : মণ্ডুকাসন, ভুজঙ্গাসন
- ☛ মানসিক উদ্বেগ : ধ্যান, যোগনিদ্রা
- ☛ স্থূলতা : সূর্যনমস্কার
- ☛ বয়স্কদের জন্য : শ্বাস-প্রশ্বাসভিত্তিক হালকা যোগ

যোগচর্চার জন্য কোন ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না, যা গ্রামীণ বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

★ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যনীতিতে আয়ুষ : সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যনীতির মূল ভিত্তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (PHC)। তবে আয়ুষ পরিষেবা এখনও প্রান্তিক। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের অভাব, বাজেট সীমাবদ্ধতা ও নীতিগত স্পষ্টতার অভাব এই ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। অথচ গ্রামীণ সমাজে আয়ুর্বেদ ও যোগ সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত।

★ নীতিগত বিশ্লেষণ :

- ☛ PHC স্তরে আয়ুর্বেদ ও যোগকে নিয়মিত পরিষেবার অন্তর্ভুক্তি।
- ☛ আয়ুষ চিকিৎসক ও যোগ প্রশিক্ষকের নিয়োগ।
- ☛ NAAC ও UGC নির্দেশিকায় স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কর্মসূচিতে যোগাভ্যাস অন্তর্ভুক্তি।
- ☛ গ্রামীণ স্বাস্থ্যশিক্ষায় আয়ুর্বেদিক জীবনশৈলী প্রচার

★ উপসংহার :

আয়ুর্বেধ ও যোগ আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার বিকল্প নয়, বরং একটি কার্যকর পরিপূরক ও প্রতিরোধমূলক পথ। জরুরি চিকিৎসায় আধুনিক চিকিৎসা অপরিহার্য হলেও, দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যবস্থাপনা, মানসিক স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ ও যোগ একটি কম-ব্যয়ী, টেঁকসই ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান প্রদান করে।

জাতীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্যনীতিতে এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হলে ভারতের ভবিষ্যৎ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেঁকসই হয়ে উঠবে। ■

প্রদর্শনের নয়, গণতন্ত্রের দর্শন—সংবিধান

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান ক্রিয়ান্বিত হয়েছিল, যেখানে ভারতবর্ষকে লোকতান্ত্রিক, সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণরাজ্য রূপে পরিভাষিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ এই দিনটিকে এবং সংবিধানের পুস্তিকাকে গৌরবের সঙ্গে মনে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে একজন ব্যক্তির দ্বারা এবং তাঁর সমর্থকদের দ্বারা প্রদর্শনের বস্তু বানিয়ে যত্র-তত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা বাস্তবে ওঁদের মানসিক স্তর সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে দিচ্ছে। বাস্তবে সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ বিধি এবং দেশের সকল নাগরিক, সংস্থা ও সরকারকে তাঁদের অধিকার এবং কর্তব্যের মার্গদর্শন প্রদান করে। ভারতের সংবিধানের মূল স্বরূপের কিছু তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরতেই এই নিবন্ধ।

ভারতীয় সংবিধান বানাতে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন সময় লেগেছিল। সংবিধান নির্মাণের প্রস্তাব ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে এম.এন রায় রেখেছিলেন এবং ক্যাবিনেট মিশন যোজনার অধীনে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা গঠনের জন্য সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। সংবিধান সভার প্রথম বৈঠক ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির কাউনশিল চেম্বারের পুস্তকলায় ভবনে শ্রীসচ্চিদানন্দ সিনহার সভাপতিত্বে ডাকা হয়েছিল। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে এই কমিটির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এই সংবিধান সভা দ্বারা ১৩টি সমিতি নির্মাণ করা হয়, যাদের উপর বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংবিধান নির্মাণের প্রাথমিক রূপ দেওয়ার সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর। সংবিধান সভার ১৬৬টি সত্রের মধ্যে, ১১৪টি সত্র প্রাথমিক রূপ দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধান বিশ্বের সবথেকে লম্বা ও বিস্তৃত লিখিত সংবিধানের অন্যতম, যার মধ্যে ২৫টি ভাগ, ১২টি অনুসূচি এবং ৪৪৮টি অনুচ্ছেদ সম্মিলিত আছে। ভারতীয় সংবিধানে ব্রিটিশ, আমেরিকা, আইরিস এবং কানাডার সংবিধানসহ বিভিন্ন স্রোত থেকে ব্যাপক রূপে প্রেরণা নেওয়া হয়েছিল। যেমন—

১) রাজ্য নীতির নির্দেশক সিদ্ধান্ত—আয়ারল্যান্ড

২) মৌলিক অধিকার—আমেরিকার সংবিধান

৩) স্বতন্ত্রতা, সমানতা এবং বন্ধুত্বের প্রস্তাবনা—ফ্রান্স

৪) পঞ্চবার্ষিকী যোজনা—ইউ.এস.এস.আর

৫) প্রস্তাবনা—সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকা

৬) আইন দ্বারা স্থাপিত প্রক্রিয়া—জাপান

৭) সংবিধানে সংশোধনের প্রক্রিয়া—দক্ষিণ আফ্রিকা

৮) আপদকালীন পরিস্থিতিতে মৌলিক অধিকারের প্রত্যাহার (withdrawn), জার্মান

৯) সমবর্তী সূচি এবং দুই সদনের সংযুক্ত বৈঠক—অস্ট্রেলিয়া থেকে নেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় সংবিধানের মূল পুস্তক হিন্দি এবং ইংরেজিতে হস্তলিখিত করা হয়েছিল। শ্রীপ্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা ইংরেজি ভাষায় লেখেন। এই কাজের জন্য তাঁর ৬ মাস সময় লেগেছিল, এবং তিনি এর জন্য কোন পারিশ্রমিক নেননি। কিন্তু তাঁর একটি শর্ত ছিল যে, প্রতিটি পাতায় তাঁর নাম প্রেম লেখা থাকবে, তৎকালীন সরকার তাঁর এই আবদার মেনে নিয়েছিল। ভারতীয় সংবিধান হিন্দি ভাষায় লেখেন শ্রীবসন্তকৃষ্ণ বৈদ্য এবং এর জন্য তিনি পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। এইটিতে নন্দলাল বোসের মার্গ দর্শনে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা চিত্রকলার প্রদর্শন করা হয়েছে। এই অমূল্য পাণ্ডুলিপি সংসদ ভবনের লাইব্রেরিতে কাচের মুখবন্ধ বাক্সে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে নাইট্রোজেন ভরা আছে যাতে কাগজ খারাপ না হয়। ২৪শে জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মূল প্রতিলিপিতে ২৮৪ জন সাংসদ হস্তাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা (যাঁরা হলেন, সুচেতা কৃপালিনী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, মালতী চৌধুরী, সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃতা কৌর, লীলা রায়, বেগম ইজাজ রসুল, কমলা চৌধুরী, হংসা মেহতা, রেনুকা রে, দুর্গাবাঈ দেশমুখ, অম্মু স্বামীনাথন, দেকশয়ানী বেলযুদ্ধন, পূর্ণিমা ব্যানার্জি এবং অ্যানি মইসকৈরীন) ছিলেন।

সংবিধানের ২৫টি ভাগ। যথা—

১) ভারতীয় সংঘ এবং তার অধিকার ক্ষেত্র—এখানে

ভারতীয় সংঘীয় সংরচনা ও ক্ষেত্রীয় অধিকারগুলোর বর্ণনা দেওয়া আছে।

২) নাগরিকতা—এখানে নাগরিকতা সম্পর্কিত প্রবাধানের বর্ণনা দেওয়া আছে।

৩) মৌলিক অধিকার প্রদান—এখানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোর বর্ণনা করা আছে।

৪) রাজ্যের নীতি নির্দেশক তত্ত্ব—এখানে এই সিদ্ধান্তগুলো বর্ণনা আছে, যা রাজ্যগুলোর নীতিগত নির্ণয় নেওয়ার সময় নজরে রাখতে হবে।

৫) মৌলিক কর্তব্য—এখানে নাগরিকদের নৈতিক ও নাগরিক কর্তব্যের বিবরণ দেওয়া আছে।

৬) সংঘ সরকার—এখানে কেন্দ্র সরকারের সংগঠন এবং কার্য সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে।

৭) রাজ্য সরকার—এখানে রাজ্য সরকারের গঠন ও কার্য সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে।

৮) কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ---এখানে কেন্দ্রশাসিত প্রদেশের প্রশাসন ও অধিকারের বিবরণ দেওয়া আছে।

৯) পঞ্চায়েত—এখানে পঞ্চায়েতগুলোর অধিকার ও কাজের বিবরণ দেওয়া আছে।

১০) নগরপালিকা—এখানে নগরপালিকাগুলোর শক্তি ও উত্তর দায়িত্বকে নির্দিষ্ট করা আছে।

১১) সহকারী সমিতি---এখানে সহকারী সমিতিগুলোর প্রবাধানের বিবরণ দেওয়া আছে।

১২) অনুসূচিত ও জনজাতি ক্ষেত্র—এখানে ওই সমস্ত ক্ষেত্রের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে।

১৩) সংঘ এবং রাজ্যের সম্পর্ক—এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৪) বিত্ত, সম্পত্তি, অনুবন্ধ এবং মোকদ্দমা—এখানে বিত্তীয় প্রবন্ধন, সম্পত্তির অধিকার এবং অনুবন্ধ সম্পর্কিত প্রবাধান প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৫) ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা—এখানে দেশের মধ্যে ব্যবসা ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা সম্পর্কে নিয়মগুলোর বিবরণ দেওয়া আছে।

১৬) সংঘ ও রাজ্যের অধীনে সেবা—এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীনে সেবার প্রবাধানের নির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে।

১৭) ন্যায়াধিকরণ—এখানে ন্যায় প্রণালী এবং ন্যায়াধিকরণ সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে।

১৮) নির্বাচন—এখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সম্পর্কিত প্রবাধানের নিয়ম প্রস্তুত করা আছে।

১৯) বর্গ সম্পর্কিত বিশেষ প্রবাধান—এখানে বিশেষ বর্গের সম্পর্কিত প্রবাধান দেওয়া আছে।

২০) রাজভাষা—এখানে রাজ ভাষাগুলো সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া আছে।

২১) আপৎকালের প্রবাধান—এখানে আপৎকালের স্থিতি ও তাদের সম্পর্কে প্রবাধান দেওয়া আছে।

২২) বিবিধ—এখানে বিভিন্ন ও অন্যান্য প্রবাধান লেখা আছে।

২৩) সংবিধান সংশোধন---এখানে সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

২৪) অস্থায়ী সংক্রমণকালীন এবং বিশেষ প্রবাধান—এখানে বিশেষ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিবরণ দেওয়া আছে।

২৫) সংক্ষিপ্ত শীর্ষক, প্রারম্ভ, হিন্দিতে অধিকারিক পাঠ ও নিরসন—এখানে সংবিধানের সংক্ষিপ্ত শীর্ষক, প্রারম্ভিক প্রবাধান নিয়ে নির্দেশ দেওয়া আছে।

সংবিধানের ১২টি অনুসূচী। যথা—

১) রাজ্যের নাম এবং ক্ষেত্রীয় অধিকারের সঙ্গে কেন্দ্রশাসিত প্রদেশগুলোর নাম এবং তাদের বিস্তার।

২) সাংবিধানিক পদাধিকারীদের বেতন, ভাতা ও বিশেষ অধিকার।

৩) শপথ এবং প্রতিজ্ঞানের প্রপত্র।

৪) রাজ্যসভার সিটের বন্টন।

৫) অনুসূচিত ক্ষেত্র এবং অনুসূচিত জনজাতির প্রশাসন।

৬) আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের জনজাতীয় ক্ষেত্রের প্রশাসন।

৭) সংঘসূচি, রাজ্যসূচি এবং সীমান্তবর্তী সূচি।

৮) সংবিধান দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত ভাষাগুলো।

৯) ভূমি সুধারক এবং জমিদারি প্রথা সম্পর্কিত অধিনিয়মের সংরক্ষণ।

১০) দল বদলের আধারে সদস্যদের অযোগ্যতা।

১১) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো শক্তি ও উত্তর দায়িত্ব।

১২) নগরপালিকাগুলোর শক্তি ও উত্তর দায়িত্ব।

ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাত্র এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এর প্রথম সংশোধন করা হয়েছিল। এই সংশোধন ভূমিসুধার সম্পর্কিত আইনকে মৌলিক অধিকারের উলংঘনের চিন্তা থেকে বাঁচানোর জন্য করা হয়েছিল। এরপর গত ৭৪ বছরে, মোট ১০৬টি সংশোধন করা হয়েছে। কোন সংশোধন করার জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে পাস করানোর পর মহামহিম রাষ্ট্রপতির মঞ্জুরি নেওয়া আবশ্যক। হরিয়ানার সোনীপতে ও.পি জিন্দাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের প্রথম সংবিধান সংগ্রহালয় কৃত্রিম বিধায় (এ.আই) পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে, যার উদঘাটন ২৩শে নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে হয়েছে। এখানে ভারতীয় সংবিধানের ১০০০টি লিথোগ্রাফিক ফটো প্রদর্শিত করা হয়েছে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডের আরম্ভ করা হয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্যারেড রাজপথে না হয়ে, ইরওয়ীন স্টেডিয়াম, কিন্সওয়ে, লালকেল্লা এবং রামলীলা ময়দানে আয়োজন করা হয়। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজপথে পতাকা উত্তোলন করেন, তখন ২১টি তোপ দ্বারা সেলামি দেওয়া হয়। গণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে কোন একজন বিদেশি নেতাকে মুখ্য অতিথি রূপে আমন্ত্রিত করার পরম্পরা আছে। ওই দিন সেনাবাহিনীর নির্বাচিত সদস্যদের পদক প্রদান করা হয়ে থাকে। প্যারেডে দেশের সেনাবাহিনীর সৌর্য্য, অস্ত্র-শস্ত্রের প্রদর্শন এবং দেশের সাংস্কৃতিক পরম্পরা প্রদর্শন করা হয়।

দেশের সংবিধানকে মর্যাদা দিয়েই তার অনুরূপ নির্দেশে, দেশ পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু পকেট থেকে লাল রঙের পুস্তক দেখিয়ে সভা করা কিংবা প্রদর্শন করা কতটা ব্যবহারিক ভাবা দরকার। এছাড়া বিদেশে গিয়ে সংবিধান বিপন্ন বলে মিথ্যাচারিতা যারা করে থাকেন, তাদের সম্পর্কে দেশবাসীর ভাবা দরকার ও নিন্দা করা উচিত। সংবিধানের তিরস্কার করা কিংবা পোড়ানো একটি অক্ষমাযোগ্য অপরাধ। কিছু কিছু ব্যক্তি সংবিধানে বর্ণিত নিয়ম-কানুনকে না মানার প্রবণতা কিংবা আংশিক রূপে মেনে রাজনীতি করার প্রয়াসকে নিন্দা করা উচিত। সংবিধান সরকার ও নাগরিক উভয়ের উপর সমানভাবে লাগু হয়ে থাকে, অর্থাৎ ভারতের সংবিধান সরকার, নাগরিক, সংস্থা সবারই উশৃঙ্খলা এবং উদন্ডতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাই সংবিধান পুস্তক প্রদর্শনের বস্তু নয়, এটি গণতন্ত্রের দর্শন বলে ভাবা দরকার এবং উপযুক্ত সম্মান দেখানো উচিত। ■

প্রতিবাদ মিছিল, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবাদ মিছিল, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণবঙ্গ

হিন্দু সমাজ ক্ষয়িষ্ণুর পথে

সুধাংশু কুমার পাত্র

গত সংখ্যার পর....

১০) ব্রহ্মদেশ : বর্তমান নাম মায়ানমার। ১১ শতকে আনাওরাহতা রাজা ছিলেন। তিনি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্য, আরব হয়ে এখানে আসেন। কিছুদিন মোঘলরা রাজত্ব করেছিল। বর্মি মুসলমানরা বৌদ্ধদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গা মুসলমানরা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধ করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তখন ১১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা ভ্রমণে আসে, তারপর স্থায়ী হয়ে থেকে যায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা স্বাধীনতা প্রদান করেছিল এই দেশকে। মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি। বৌদ্ধ ৫ কোটি ৪০ লক্ষ, খ্রিস্টান ২৪ লক্ষ, মুসলমান ২৫ লক্ষ, হিন্দুরা ১০ লক্ষ ও অন্যান্য ১ লক্ষ। এখানে ৪ হাজার বৌদ্ধমন্দির, ২৫০ টি হিন্দু মন্দির ট্যাগামিন, শ্বেদাগণ প্যাগোডা, বৌদ্ধস্তুপ আছে। ৫০ টি মসজিদ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১১) শ্রীলঙ্কা : পূর্ব নাম সিংহল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে বিজয় সিংহ শ্রীলঙ্কার রাজা ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের পুত্র আরহাথ মাহিন্দা বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন। ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগাল উপনিবেশ করে। ১৪০ বছর পর ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশ করে। ১৮১৫-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন ছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশরা তামিল হিন্দু ও সিংহলিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিয়েছিল। ২৬ বছর ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলে। ১০ লক্ষ তামিল হিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রীলঙ্কার মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ। বৌদ্ধ ১ কোটি ৮০ লক্ষ, হিন্দু ২৯ লক্ষ, মুসলমান ২৪ লক্ষ, খ্রিস্টান ১৫ লক্ষ এবং অন্যান্য ২ লক্ষ। বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির আছে এই দেশে। মসজিদ আছে ২৫০০-র বেশি, মাদ্রাসা আছে ২০০-র বেশি। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ২০ লক্ষ ছিল, ২০২৫ এ সেই সংখ্যা হয় ২৪ লক্ষ তীব্র গতিতে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরব, মালয়, ভারত থেকে মুসলমানরা শ্রীলঙ্কায় গিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করেই যাচ্ছে। সরকারের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত শুরু হয়ে গেছে। শতাধিক কোরআন শিক্ষা কেন্দ্র শুরু হয়ে গেছে।

১২) মালদ্বীপ : ৫০০ শতাব্দীতে ব্রহ্মাদত্যির পুত্র ভীমামারি রাজত্ব করেন। ৭০০ বছর ধরে হিন্দু ও বৌদ্ধ এক সঙ্গে বসবাস করত এবং ১৪০০ বছর বৌদ্ধধর্ম ছিল। সম্রাট অশোক নিজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক পাঠিয়েছিলেন সেখানে। ১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ রাজা মধুবনী ধর্মান্তরিত হন মুসলিম কন্যাকে বিবাহ করে। রাজার বিয়ের পরের দিনই, একই সঙ্গে ৬৫ হাজার বৌদ্ধ মুসলমান হয়ে যান। ১১৯২টি দ্বীপের মধ্যে ১৯৮ দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। বর্তমানে এই দ্বীপ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে জারি হয়, মুসলমান না হলে এখানে থাকতে পারবে না। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৫ জন মুসলমান সংগ্রহালয়ের গণেশ, শিব, বৌদ্ধ মূর্তি ভেঙে দেয়। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটা দ্বীপ এমন আছে, যেখানে মাত্র ১ মিটার জল বৃদ্ধি হলেই তা সমুদ্রে ডুবে যাবে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ২৬শে জুলাই স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

১৩) ভুটান : এর অর্থ উঁচু জমি। প্রথম রাজার নাম স্যার ইউগেন ওয়াংচুক, তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করতেন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক রাজা হলেন। জাতির জনক ছিলেন জিগমে দোরজী ওয়াংচুক। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে ডেমোক্রেটিক দেশ হয় ভুটান। ভুটানের সার্বভৌমিকতা ভারতের হাতে। এখানকার জনসংখ্যা ৮ লক্ষ। মুসলমান ১০ হাজার। এখানে মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ, প্রকাশ্যে নামাজ পড়া বন্ধ। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা খুব দ্রুতগতিতে সংখ্যা বাড়াচ্ছে। চীন ১০০ বছরে তিব্বত পূর্ব তুর্কিস্তান ও মঙ্গোলিয়া কব্জা করেছে। সেজন্য ভারতের সঙ্গে ভুটান মধুর সম্পর্ক রেখেছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরও অনেক আছে এখানে।

১৪) পাকিস্তান : ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনের সময় এই দেশকে পৃথক করে ব্রিটিশরা। এই দেখে মুসলিম অত্যাচারে লক্ষাধিক হিন্দু মারা গেছে, লক্ষাধিক হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে, কয়েক লক্ষ হিন্দু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা জিহাদি তত্ত্বে দেশ চালাচ্ছে। এক সময় পাকিস্তানের ২০% হিন্দু ছিল, কিন্তু এখন মাত্র ২% আছে। ভারতের সঙ্গে সব সময় ছায়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে এরা।

সরকারি সাহায্যে, সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুসলমানরা ভারতে অশান্তি চালাচ্ছে, পাকিস্তানে শতাধিক মন্দির ধ্বংস করেছে মুসলিমরা।

১৫) বাংলাদেশ : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান, 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল, বর্তমানে ১৮ কোটি। এর মধ্যে হিন্দু ১ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল, অর্থাৎ ২৮%, কিন্তু এখন মাত্র ৮% হিন্দু পড়ে আছে ওই দেশে। পরিকল্পিতভাবে হিন্দু শূন্য করছে ওরা। মুসলমানদের মধ্যে কোন কৃতজ্ঞতার বোধ নেই। ২ কোটি হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে। প্রতিদিন অত্যাচার, নারী ও সম্পদ লুণ্ঠন, চুরি ও অসামাজিক কাজ বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানরা করেই যাচ্ছে।

উপরোক্ত বিবরণ জানার পর, ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? সব দেশে মুসলমানরা যেভাবেই হোক শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলে আপনার মনে হচ্ছে না কি? ভারতকে কি 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করা হবে না? বর্তমানে যে সব হিন্দু ভারতবর্ষে বাস করেন তারা রাষ্ট্রীয় দলকে ক্ষমতায় নিয়ে এসে সংবিধান বদল করার কথা ভাববে কি? অখন্ড সাংস্কৃতিক ভারত গঠন করা আবশ্যিক নয় কি? বাংলাদেশে, ভারতে ও অন্য দেশের হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে, ভারত কি দর্শক হয়ে থাকবে? ভারতে হিন্দু জাগরণ কি অসম্ভব? মুসলিমদের আচরণ বিশ্বকে অবগত করানোর জন্য গঠিত হোক এক ফোরাম গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে?

বিশ্বে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ধর্মানুসারে জনসংখ্যা

ধর্মের নাম	কোটি	শতাংশ
খ্রিস্টান	২৬৯.৭০	৩১%
মুসলমান	২০১.৮৪	২৩.২%
হিন্দু	১৩০.৫০	১৫%
বৌদ্ধ	৬১.৭৭	৭.১%
চীনা লোকধর্ম	৫১.৩৩	৫.৯%
আত্মবাদ	২.৭২	?%
ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক	১২৫.০০	১৪.৩১%
আঞ্চলিক ধর্ম	১৪.০০	১.৬%
আফ্রিকান ধর্ম	১.২০	
ইহুদি	১.৭৫	
বাহাই	০.৭০	
শিন্টো	০.৪০	
জরথ্রাস	০.২৭	
কাওদাই	০.৪৫	
শিখ	০.৪৩	
জৈন	০.৪	০.৯৯%
অন্যান্য	৭.৪৮	০.৯%
মোট	৮৭০	১০০%

সৎসঙ্গ, আলিপুরদুয়ার, উত্তরবঙ্গ

ওঁ

কেন্দ্রীয় প্রন্ন্যাসী মণ্ডলের বৈঠক

১৭-১৮-১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রস্তাব নং-২

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঠিক ও যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজন

বর্তমানে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ধারণা এবং এর ন্যায্যতা স্পষ্টভাবে বোঝার প্রয়োজন।

ভারতে, কিছু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকারের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে, কিছু সম্প্রদায় এই সুযোগের অপব্যবহার করছে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন চিকিৎসা ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসী ও দেশবিরোধী কার্যকলাপে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, একই সাথে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়।

সংখ্যালঘুবাদের ধারণা অনুসারে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্ট/কমিটির জন্য কেবল সংখ্যালঘু পরিচয় থাকা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা অধিকার আইনের অধীনে, তাদের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৫% হওয়া উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি।

১৯৯২ সালে, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীকালে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন প্রতিষ্ঠা করে, যার অধীনে সংখ্যালঘুদের সীমাহীন স্বাধীনতা এবং সুযোগ- সুবিধা প্রদান করা হয়। সংখ্যালঘুবাদের এই ধারণার ফলে সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়, শিক্ষাকেন্দ্র এবং পাঠ্যক্রমের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করেছে।

ভারত 'এক জনগণ, এক জাতি', এটাই ছিল আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের মৌলিক বিশ্বাস।

ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার সাধারণ জনগণের তুলনায় বেশি। অতএব, হিন্দু সমাজের অনেক অংশ, বৃহত্তর অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার আকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে, সংখ্যালঘু মর্যাদা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য উল্লেখযোগ্য—

১. ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ধারণায় সংখ্যালঘু শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।
২. ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের সাথে কখনও বৈষম্য করা হয়নি।
৩. দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এমন সম্প্রদায় কিভাবে সংখ্যালঘু হতে পারে?
৪. যখন সংবিধান ভাষা, অঞ্চল, লিঙ্গ উপাসনা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে, তখন সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দেশকে সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

যারা সংখ্যালঘু হতে পারে না :

১. বিশ্বের জনসংখ্যার ১ম এবং ২য় স্থানে থাকা সম্প্রদায়গুলো, যেমন খ্রিস্টান এবং মুসলিম।
২. বিশ্বের জনসংখ্যার উপর প্রভাবশালী বহুজাতিক ধর্ম।
৩. বিশ্বে এবং ভারতেও যাদের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. যে সব সম্প্রদায় ধর্মের ভিত্তিতে নির্যাতনের সম্মুখীন হয়নি।

সংখ্যালঘুর একটি যুক্তিসঙ্গত ও যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে। অতীতে, সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে সংখ্যালঘু শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে এবং সংখ্যালঘুবাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে।

সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য উপলব্ধ সমস্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা এক মানুষ, এক জাতি-এর মৌলিক নীতি অনুসারে সমস্ত ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য উপলব্ধ হওয়া উচিত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদ দেশের আলোকিত মানুষকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছে এবং ভারত সরকার এবং সংসদের কাছে সংখ্যালঘু শব্দটির একটি সঠিক এবং যৌক্তিক সংজ্ঞা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

উপস্থাপক : শ্রী অশোকজি তিওয়ারি, হরিদ্বার

অনুমোদিত : শ্রী মানিকন্দন, তামিলনাড়ু

প্রস্তাব নং-৩

দেশে জিহাদি চ্যালেঞ্জ এবং তাদের সমাধান

মুসলিমদের একাংশের কুসংস্কার এবং ধর্মান্ধতার দ্বারা উস্কে দেওয়া জিহাদি মানসিকতা আজ সমগ্র বিশ্বকে জর্জরিত করেছে। ১৪ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বিশ্বখ্যাত বন্ডি সমুদ্র সৈকতে একটি জিহাদি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাটি নিশ্চিত করে যে জিহাদি সন্ত্রাসবাদ এখন কেবল ভারতের জন্যই নয়, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি গুরুতর এবং ক্রমবর্ধমান হুমকি হয়ে উঠেছে। ভারত গত ১,৩০০ বছর ধরে এর ভয়াবহতা ভোগ করছে। ভারতে, জিহাদি সন্ত্রাসীদের নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত হওয়ার ছদ্মবেশে আশ্রয় দেওয়া হয়। ভারত সহ বিশ্বব্যাপী অসংখ্য জিহাদি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং অধ্যাপকদের জড়িত করা হয়েছে। ওসামা বিন লাদেন, আল-জাওয়াহিরি, আফজাল গুরু এবং ডঃ উমর উন-নবী সহ অনেক সন্ত্রাসী উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। সম্প্রতি, ফরিদাবাদ ভিত্তিক আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুজাম্মিলকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক তৈরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও, ডঃ শাহীন শহীদ সহ বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো গ্রেপ্তার করেছে। তারা সকলেই লালকেল্লা এলাকায় সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষিত এবং পেশাদার মুসলমানদের একটি অংশ জিহাদের প্রতি ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠছে এবং তারা কেবল ভারতের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে, ইসলামের মৌলিক আদেশ-নিষেধগুলো বোঝার প্রয়োজন, যা তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত। এখানে, যে ইসলামে বিশ্বাস করে তাকে মোমিন এবং যে ইসলামে বিশ্বাস করে না তাকে কাফির বলে গণ্য করা হয়। ১৯৮১ সালে, দিল্লির একটি আদালতও স্বীকার করে যে কুরআনের ২৪টি আয়াতে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রবণতা রয়েছে। হাদিসে ছলনা, বলপ্রয়োগ এবং অর্থের মাধ্যমে, অর্থাৎ জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের মুসলিমে রূপান্তরিত করার ছয়টি উপায় বর্ণনা করা হয়েছে, যা জানা এবং বোঝা জরুরি।

১. জিহাদ আল-নাফস (মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে ঘৃণা)। এটি কাফেরদের প্রতি ঘৃণা পোষণের মাধ্যমে শুরু হয়।
২. জিহাদ বিল কালাম প্রচারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার।
৩. জিহাদ বিলমাল : জিহাদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
৪. জিহাদ বিল, লিসান ইত্যাদি কথার মাধ্যমে হোক বা কলমের মাধ্যমে ধর্মগুরু ও মুসলিম নেতাদের বিষাক্ত বক্তৃতা এবং নিবন্ধ।
৫. জিহাদ বিল আমাল জিহাদ (লাভ জিহাদ, থুতু জিহাদ, ভূমি জিহাদ, শিক্ষা জিহাদ। জিহাদিদের বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি) বাস্তবায়ন এর আওতায় পড়ে।
৬. জিহাদ আল-কিতাল-কাফেরদের উপর অতর্কিত আক্রমণ, সরাসরি যুদ্ধ (বোমা হামলা, গণহত্যা, উৎসবে আক্রমণ, গরু জবাই, পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদি) এর অন্তর্ভুক্ত।

জিহাদের এই ধারা বিশ্ব মানবতা, ভারতের সংবিধান এবং সামাজিক ভারসাম্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। এটি জাতির নিরাপত্তা এবং সামাজিক অখণ্ডতার উপর সরাসরি আক্রমণ। হাদিসের এই উল্লেখগুলো ব্যাখ্যা করে যে ১৪০০ বছর আগে যাদের পাঁচটি গ্রামও ছিল না, তারা এখন ৫৬টি জাতিতে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনা পর্ষদ কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমস্ত রাজ্য সরকারের কাছে এটি দাবি করছে যে—

- জিহাদি মানসিকতার বীজ বপনকারী মাদ্রাসাগুলোকে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত, এবং তাদের পাঠ্যক্রম এবং সমস্ত শিক্ষকদের তদারকি করা উচিত। দেশের অবৈধ মাদ্রাসা এবং মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। মাদ্রাসাগুলোর আর্থিক নিরীক্ষা এবং পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন করা উচিত এবং তাদের কোনও আর্থিক সহায়তা নেওয়া উচিত নয়। মাদ্রাসা শিক্ষার (তালিমান) পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী শিক্ষা বাস্তবায়ন করা উচিত। ইসলামী মৌলবাদী সাহিত্য নিষিদ্ধ করা উচিত, এবং ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংঘটিত দেশবিরোধী কার্যকলাপের তদন্ত করা উচিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
- বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী এবং অন্যান্য মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের অবিলম্বে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

- জিহাদি আর্থিক ব্যবস্থা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং ইসলামী ব্যাংকিং ও হালাল অর্থনীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।
- অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা উচিত।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনা পর্ষদ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হিন্দু সমাজের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে :

- হিন্দু জন্মহার কমতে দেবেন না।
- আপনার এলাকায় ঘটছে এমন কোনও দেশবিরোধী বা হিন্দুবিরোধী ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় প্রশাসন বা সংস্থাকে অবহিত করুন এবং সমাজকেও সাথে নিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন।
- পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে হিন্দু মূল্যবোধ জাগিয়ে জাতীয়তাবাদী করে তোলো, যাতে তারা ভবিষ্যতে যেকোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে।
- সামাজিক সংগঠন, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ফোরামের মাধ্যমে সচেতনতা, সংলাপ এবং আদর্শিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা।
- হিন্দুদের অপমান করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় যে মিথ্যা, প্রদাহজনক এবং দেশবিরোধী প্রচারণা ছড়ানো হচ্ছে, তার বাস্তব প্রতিহত করুন।

ভিএইচপির পরিচালনা পর্ষদ বিশ্বাস করে যে জিহাদ কেবল ন্যায়বিচারের বিষয় নয় বরং মুসলমানদের একটি বৃহৎ অংশের দ্বারা ধারণ করা একটি ধর্মীয় বিশ্বাস। এটি আদর্শগতভাবে লড়াই করতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে সহিংসতার এই পথ বর্তমান মানবিক মূল্যবোধের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

উপস্থাপক : শ্রী বিজয় শঙ্কর তিওয়ারি, গাজিয়াবাদ
অনুমোদিত : শ্রী রবি কুমার, বিজয়ওয়াড়া

বিবৃতি-১

মন্দিরের দান এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত

মন্দিরগুলি হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু, এবং পূজা হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত। প্রাচীনকাল থেকেই মন্দিরগুলো ধর্মীয় জাগরণ এবং সামাজিক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে আসছে। মন্দিরগুলো পাঁচটি উপাসনা বিদ্যালয়ের সেবা করেছে: বেদশালা, আরোগ্য শালা, সঙ্গীত শালা, গোশালা এবং মল্লশালা, সেইসাথে ন্যায়বিচারের ব্যবস্থাও। আমাদের দেশে, যতদিন মন্দিরগুলো তাদের মূল ভূমিকায় সক্রিয় ছিল, ততদিন জাতি, সমাজ এবং পরিবার নিরাপদ এবং সংস্কৃতিবান ছিল। মুঘল শাসনামলে, মন্দির ধ্বংস এবং দুর্নীতির প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে অব্যহত ছিল এবং সাধারণ মানুষ তাদের রক্ষা করার জন্য আত্মত্যাগ করেছিল। মন্দিরের সমৃদ্ধি দেখে, ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করে, মন্দিরের তহবিলের অপব্যবহারের পথ খুলে দেয়। আজও, ভারতের রাজ্য সরকারগুলো মন্দিরের তহবিলের অপব্যবহার অব্যহত রেখেছে। এটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। হিন্দুরা ভক্তি এবং বিশ্বাসের সাথে মন্দিরে অর্থ দান করে। সরকার এই অর্থ ধর্মবিরোধী কার্যকলাপকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যবহার করে। মন্দিরের জমিরও অপব্যবহার করা হয়। রাজ্য সরকারগুলো ধর্মান্তর এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালানোর জন্য মসজিদ এবং গির্জাগুলিকে অবাধ অনুমতি দেয়।

মন্দিরগুলো ভারতের প্রাচীন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হিন্দু সমাজ মন্দিরগুলোকে লালন-পালন করে আসছে। মন্দির পরিচালনায় এই সমাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। ব্রিটিশরা মন্দিরের তহবিল বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার পরেও, ভারত সরকার মন্দিরের মর্যাদা এবং সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা না করে আইনের নামে ব্রিটিশ নীতি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই কারণেই মন্দিরগুলোর অবস্থা খারাপ এবং একই তহবিলের অপব্যবহার হচ্ছে।

কেরালার বিখ্যাত শবরীমালা মন্দিরের প্রবেশপথে লাগানো কোটি কোটি টাকার সোনা সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। ওয়ানাড় ১৯৭৫ সালের বিষ্ণু মন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, "মন্দিরের নৈবেদ্য এবং অর্থ ঈশ্বরের সম্পত্তি। এটি কেবল মন্দিরের সুবিধার জন্য ব্যবহার করা উচিত বা সুরক্ষিত রাখা উচিত। এটি বেসরকারি বা সরকারি ব্যাংকগুলিকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। মন্দিরের অর্থ কেবল জাতীয় ব্যাংকগুলিতে রাখা উচিত, যাতে মন্দিরগুলো যুক্তিসঙ্গত সুদ পেতে পারে।"

সুপ্রিম কোর্ট মাদ্রাজ হাইকোর্টের সেই সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে, যা মন্দিরের তহবিল ব্যবহার করে বিবাহের হল নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার কর্ণাটক রাজ্য সরকারের আদেশ

বাতিল করে দিয়েছে। কর্ণাটকের আরেকটি মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে মন্দির বোর্ডগুলিতে কেবল হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

তামিলনাড়ু, রাজ্য সরকার চেন্নাই হাইকোর্টে লিখিতভাবে জানিয়েছে যে ১৯৭৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার মন্দির থেকে ৫ লক্ষ কেজি সোনা নিয়েছে, তা গলিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছে। এর থেকে রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকার সুদ পায়। সরকার বলছে যে এই টাকা মন্দিরগুলোর উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্যদিকে একটি জরিপ অনুসারে, তামিলনাড়ু রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১২০০০ মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৩৭০০০ মন্দিরে পিয়ন থেকে পুরোহিত পর্যন্ত মাত্র একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে মন্দিরের জমি কেলেঙ্কারি : তামিলনাড়ুতে ৫০ হাজার একর মন্দিরের জমি কেলেঙ্কারির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে এইচআরসিএ বিভাগের রেকর্ড অনুসারে, তামিলনাড়ুতে মন্দিরগুলোর ৫ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমি ছিল।

২০১৯-২০ সালে, একই বিভাগের নীতিমালায় বলা হয়েছে যে তামিলনাড়ুতে ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জমি মন্দিরের মালিকানাধীন।

তাই হাইকোর্ট তাদের জিজ্ঞাসা করে, ২০ বছরে ৪৭, ০০০ একর মন্দিরের জমি কোথায় গেল? সত্য হল যে সরকারের মালিকানাধীন বাকি ৪৭৮,০০০ একর জমিও দখল করা হয়েছে।

২০২১ সালে, হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে জমিটি খালি করার নির্দেশ দেয়। এরপর সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টকে বিষয়টি সমাধানের নির্দেশ দেয়। ২০২৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর একই রকম আদেশ জারি করা হয়। হাইকোর্ট জানিয়েছে যে ২৭ জন সরকারি কর্মকর্তা, ৪৯ জন উদ্যোক্তা এবং ৩৮ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধভাবে জমিটি দখল করছেন। জমিটি এখনও খালি করা হয়নি।

তামিলনাড়ুতে তকার্তিগাই দীপমদ ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম আলোর উপাসনা করে, তাই দীপাবলি উৎসব সর্বত্র পালিত হয়। মাদুরাইয়ের কাছে তিরুপ্পার কুন্ড্রম পাহাড়ে অবস্থিত আরুলমিগু সুব্রহ্মণ্য স্বামী মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভগবান মুরুগানের জন্ম স্মরণে কার্তিক মাসে প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। এই প্রাচীন ঐতিহ্য ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু। সপ্তদশ শতাব্দীতে মন্দিরের কাছে নির্মিত একটি মন্দিরের উপর ভিত্তি করে, এখন এই ঐতিহ্যের বিরোধিতা করার জন্য আদালতের দ্বারস্ত হয়েছে।

হাইকোর্ট যখন প্রদীপ জ্বালানোর ঐতিহ্য অব্যহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে, তখন হিন্দু বিরোধী শক্তিগুলো তাকে অভিশংসনের ষড়যন্ত্র করছে। ১০০ জনেরও বেশি সংসদ সদস্য অভিশংসনের জন্য একটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন এবং লোকসভার স্পিকারের কাছে এটি পেশ করেছেন। এটি বিশ্বাসঘাতক বামপন্থীদের দ্বারা এই দেশের বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবমাননার একটি কাজ, যা গণতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান এবং বিচার ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক হুমকি।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর, শ্রী তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পবিত্র নৈবেদ্যের জন্য ব্যবহৃত ঘিতে পাম তেল, পশুর চর্বি এবং মাছের তেল পাওয়া যায়।

তিরুপতি মন্দিরে অর্থ দানকারী ভক্তদের আশীর্বাদ হিসেবে একটি সিল্কের স্কার্ফ উপহার দেওয়া হয়। এর মধ্যেও ৫৪ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ঘটেছে। এই দুর্নীতি ২০১৫ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত অব্যহত ছিল। এটি সনাতন ধর্মের বিশ্বাসের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিহারে, মন্দিরের ৮০% জমি অবৈধভাবে দখলে রয়েছে। রাজস্থানেও, মন্দিরের জমি অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে, সরকার ৫০০ একর মন্দিরের জমি বিক্রির নির্দেশ দিয়েছে।

জম্মু কাশ্মীর—মাতা বৈষ্ণো দেবী শ্রাইন বোর্ড পরিচালিত মেডিকেল কলেজে, ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬ জন মুসলিম। শ্রাইন বোর্ডের ১,২০০ কর্মচারীর মধ্যে ৪১৭ জন মুসলিম। এটিও হিন্দু ভক্তদের দানের অপব্যবহার।

হিন্দু ধর্ম এবং সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন মন্দিরগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের কারণেই এই ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে। অতএব, মন্দির পরিচালনা এমন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, যাদের মন্দিরে বিশ্বাস আছে।

এইভাবে, শুধুমাত্র হিন্দু মন্দিরগুলোর সম্পদ এবং জমি লুণ্ঠন করা হচ্ছে। অতএব, সারা দেশে মন্দিরগুলোর জন্য অভিন্ন আইন থাকা এবং তাদের সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা অপরিহার্য।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনা পর্ষদের স্পষ্ট অভিমত যে হিন্দুদের অর্থ হিন্দু কার্যের জন্য, হিন্দু মন্দিরের দান এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

বিবৃতি-২

জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি

মাতৃভূমির উপাসনা করে এবং সমগ্র জাতির মধ্যে চেতনা জাগিয়ে তোলে এমন একটি অসাধারণ গান, বন্দেমাতরম রচনার ১৫০তম বার্ষিকীর শুভ উপলক্ষে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে এবং শ্রদ্ধা জানায়। ১৮৭৫ সালে রচিত এই গানটি ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চস্বরে গেয়েছিলেন, যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। তারপর থেকে, এই গানটি কেবল একটি দেশপ্রেমিক মন্ত্রই নয় বরং একটি জাতীয় ঘোষণা, জাতীয় চেতনার প্রতিধ্বনি এবং জাতির আত্মায় পরিণত হয়েছে। বন্দেমাতরম এখনও তরুণ এবং বৃদ্ধ সকল প্রজন্মের নাগরিকদের উপর অনুপ্রেরণামূলক প্রভাব ফেলে। এর কেবলমাত্র উচ্চারণই মানুষের হৃদয়কে উৎসাহে ভরিয়ে দেয় এবং জাতির প্রতি নিবেদনকে অনুপ্রাণিত করে।

এই গানটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস এবং বিপ্লবের মন্ত্র হয়ে ওঠে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বিপ্লবীরা হাসিমুখে সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করেছিলেন এবং তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রদ্ধেয় ডঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের শৈশবের একটি ঘটনা, নাগপুরে, বন্দেমাতরমের দেশব্যাপী আবেদনের গভীরতা তুলে ধরে। এই মহান মন্ত্রের ব্যাপকতা বোঝা যায় যে দেশের অনেক পণ্ডিত এবং মহাপুরুষ, যেমন মহর্ষি শ্রীঅরবিন্দ, মাদাম ভিকাজি কামা, লালা হরদয়াল, লালা লাজপত রায়, প্রমুখ, তাদের সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের শিরোনামে 'বন্দেমাতরম' যুক্ত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও বহু বছর ধরে 'বন্দেমাতরম' দিয়ে তাঁর চিঠিগুলো শেষ করেছিলেন।

১৯০৭ সাল পর্যন্ত সকল আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মন্ত্র ছিল বন্দে মাতরম। স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে কার্যকর ও সফল আন্দোলন, 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন', বন্দেমাতরম মন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় সকল ধরনের অত্যাচার সহ্য করেছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত, দেশের সকল অংশ একসাথে এই গানটি গেয়েছিল। 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতি অনুসরণকারী ব্রিটিশ সরকার এতে বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং ১৯০৭ সালে বন্দেমাতরম গাওয়া নিষিদ্ধ করে। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বন্দেমাতরম গাওয়া একদল মুসলিম নেতা হঠাৎ করে ১৯০৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে এর গাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মুসলিম তোষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ কেউ এই বিরোধিতাকে আরও তীব্র করে তোলেন। তারপর থেকে, বন্দেমাতরমের বিরোধিতার নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি শুরু হয়।

বন্দেমাতরম হল জাতির আত্মার গান, যা সকলকে অনুপ্রাণিত করে। ১৫০ বছর পরেও, এই মন্ত্র সমগ্র দেশকে জাতির প্রতি ভক্তির অনুভূতিতে ভরিয়ে দেওয়ার শক্তি রাখে। জাতীয় চেতনার নবজাগরণের এই পবিত্র সময়ে, এই মহান মন্ত্রকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আজ যখন অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন বন্দে মাতরম হল সেই সুতো যা আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। ভারতের সকল অঞ্চল, বর্ণ এবং ভাষাতেই এর স্বাভাবিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। আজও, এটি জাতীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং ঐক্যের অনুভূতির একটি স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে। সমগ্র জাতি এই সত্যটি সম্পর্কে অবগত যে মুসলিম তোষণের কারণে জাতীয় সঙ্গীত বিভক্ত হয়েছিল। সমগ্র গানে জাতির আত্মা প্রতিফলিত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) জাতির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে তারা যেন সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম পাঠ করে, মুখস্ত করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটি সম্পূর্ণরূপে গায়। জাতীয় সঙ্গীতের সম্মিলিত গাওয়ার জন্য বৃহত্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত এবং কার্যকর সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। ■

ভুল সংশোধন

গত মাসের সংখ্যায় একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল সংশোধন করতে চাইছি। আদিত্য দেবের লেখার শিরোনাম 'বিশ্ব অর্থব্যবস্থার অবক্ষয় : লাভ জিহাদ'-এর স্থলে 'হালাল জিহাদ' হবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায়, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তাদের মামলা থেকে মুক্তি

গত ৯ই ডিসেম্বর ২০২৫ দীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে চলে আসা মামলার সমাপ্তি হল। মামলাটি শুরু হয়েছিল ২০০২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। কারণ হচ্ছে গুজরাটের আমেদাবাদ শহরের অক্ষরধাম মন্দিরে অতর্কিতে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী মুসলমান এলোপাথারি গুলি চালিয়ে প্রায় ৫০ জন হিন্দুকে হত্যা করে এবং ৮০ জনকে গুরুতরভাবে আহত করে। ঐ নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা ভারত বন্ধ আহ্বান করে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরাও প্রতিটি জেলাতে শান্তিপূর্ণ বন্ধ পালনের আহ্বান জানাই, বন্ধ শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। তথাপি বাম শাসকের পুলিশ আমাদের ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং ১৪৩/১৪৯/২৮৩/৩৫৩/৫০৬/৩৪১ আই পি সি ধারায় কেস চালু করে। তারপর শুধু তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে, শেষমেষ অশান্তি করার কোন প্রমাণ না থাকায় আমরা ঐ কেস থেকে মুক্তি পায়। ঐ দীর্ঘ ২৩ বৎসরের মধ্যে আমাদের ৭ জন কার্যকর্তা কেস সমাপ্ত হওয়ার আগেই বিভিন্ন সময়ে পরলোকগমন করেন। আমরা যারা বেঁচে আছি যেমন শ্রীকুশল কুণ্ডু, দেবাশীষ সরকার, প্রলয় নাথ, গৌতম কর্মকার, প্রতাপ দাস, চন্দন চ্যাটার্জী, অঞ্জলি মাহাতো, সন্ধ্যা সেন। দীর্ঘ সময় ধরে মামলা লড়ার জন্য পরিষদের ব্রহ্মপুর জেলার পক্ষ থেকে সকলকে সম্মানিত করা হয়।

মধ্যবঙ্গ প্রান্ত বৈঠক

গত ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারি ২০২৬ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্য বঙ্গ প্রান্তের ষান্মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উত্তর নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সরস্বতী শিশু মন্দিরের ভবনে। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ সংগঠন মহামন্ত্রী মাননীয় বিনায়ক রাও দেশপান্ডে মহাশয়, ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক মাননীয় সোহন সিংহ সোলাঙ্কিজী মহাশয়, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সহ-সভানেত্রী সুনন্দা ঠাকুর মহাশয়া, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক মাননীয় তরুণকুমার লায়েক ও মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক বিজয় পাতর মহাশয় এবং প্রান্ত, জেলা কার্যকর্তারা। পরিশেষে নদীয়া উত্তরের ধর্মাচার্য প্রমূখ ত্রিবিক্রম মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় বিনায়ক রাও দেশপান্ডে আগামী দিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যপ্রণালী কি হবে তার বিস্তারিত আলোচনা করেন। জয় শ্রীরাম।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা চা বাগান ক্ষেত্রে সৎসঙ্গের বাদ্যযন্ত্র সমর্পণ

আলিপুরদুয়ার জেলা চা বাগান ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ বাদ্যযন্ত্রের সমর্পণ কার্যক্রম হাসিমারা গুরুদুয়ারা কেন্দ্রে ০৯/১২/২০২৫ তারিখ সম্পন্ন করা হল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারা সমর্পিত সেই বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সমূহ চা বাগান ক্ষেত্রের সংস্কৃতি প্রেমী আদিবাসী সদস্যদের হস্তে অর্পণ করলেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বাধী ধ্যানমূর্তি মাতাজি। তিনি সৎসঙ্গের মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দকে আশীর্বচন প্রদান করলেন। চা বাগান সমূহে নেশা মুক্তির ব্যাপারে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, চা বাগান ক্ষেত্রগুলোতে হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তকরণ বিষয়ে তিনি শঙ্কা জাহির করেছিলেন। ভারতীয় সনাতনী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল ধারক হচ্ছে আদিবাসী সমাজ। তাদের নিজ ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই হচ্ছে লক্ষ্য। তারা যাতে নিজ সনাতনী তথা হিন্দু ধর্মের প্রতি আরো উদ্বুদ্ধ ও শ্রদ্ধাবান হতে পারে, তার জন্যেই এই আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সভাপতি শ্রীশ্যামজি শর্মা এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক শ্রীঅনুপকুমার মণ্ডল, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সৎসঙ্গ প্রমুখ শ্রীপ্রদীপ থাপা, দুর্গাবাহিনী উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজিকা শ্রীমতি সরস্বতী রাজগর।

গুরু গোবিন্দ সিং ও তাঁর পরিবারের আত্মবলিদানের স্মৃতিকথা

২১ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর এই সপ্তাহে গুরু গোবিন্দ সিং-এর পুত্রদের (সাহেবজাদা অজীত সিং, জুজহার সিং, জোরওয়ার সিং, ফতেহ সিং) আত্মবলিদানের স্মৃতিচারণ করা হয়, যারা তাদের বিশ্বাস ও ধর্ম রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের বলিদানকে স্মরণ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরঙ্গ দল ব্যারাকপুর ক্যান্ট প্রখণ্ডের পক্ষ থেকে গুরুদ্বারে গুরু গোবিন্দ সিং জি-র প্রণাম করলেন এবং গুরুদ্বার থেকে তার পরিবারের বলিদানে সমন্ধে কিছু কথা বললেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

গত ১১ই ডিসেম্বর, ২০২৫ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সেবার ট্রাস্ট, মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের আমতা শিশু মন্দিরের শিশু, অভিভাবক এবং দিদিভাইদের নিয়ে খড়গপুরে স্থিত আই.আই.টি পরিদর্শনের কার্যক্রম রাখা হয়। আই.আই.টি-র নির্দেশক শ্রীসুমন চক্রবর্তী মহাশয় এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য স্বীকৃতি দেন। মোট ৬০ জন এই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছেন। গোপালী আশ্রমে সকলের জন্য দুপুরের ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই আনন্দ লাভ করেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে পথসভা

২রা জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ব্যারাকপুর গ্রামীণ প্রখণ্ডের উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে জিহাদী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে এই পথসভা। স্থান : গণেশপুর বটতলা সূর্য সংঘ ক্লাবের সন্নিকটে, দেবপুকুর। সন্ধ্যে ৬ ঘটিকায়। ব্যারাকপুর জেলার তরফ থেকে ওই পথসভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন—পূজ্যপাদ স্বামী জয়দেবানন্দজী মহারাজ, শ্রীসোনা দাস অর্চক পুরোহিত প্রমুখ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ; শ্রীসুব্রত চ্যাটার্জী, ধর্মাচার্য সম্পর্ক প্রমুখ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত; শ্রীগৌতম দত্ত, সহ-সম্পাদক, ব্যারাকপুর জেলা; শ্রীরাজেশ মিশ্রা, বজরং সংযোজক, ব্যারাকপুর জেলা। জেলা ও প্রখণ্ড কার্যকর্তারা উপস্থিত থেকে কার্যক্রমটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার চলেছে এবং হিন্দুদের নৃশংস হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তা ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু সমাজকে বিচলিত করেছে। বিশেষ করে হিন্দু যুবক দ্বিপুচন্দ্র দাসকে (মিথ্যা) ঈশা নিন্দা করার অজুহাতে, গাছে ঝুলিয়ে আগুন লাগানোর ঘটনা মৌলবাদী জেহাদীদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসী দেখছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমগ্র ভারতবর্ষে এই বর্বরতার প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভার আয়োজন করে। বাংলাদেশের হাইকমিশনে প্রতিবাদ পত্র জ্ঞাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই প্রতিবাদ মিছিল এবং পথসভা করা হয়। শিলিগুড়িতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর প্রতিবাদে সেখানকার ভিসা অফিস বন্ধ করে দিয়েছিল।

প্রতিবাদ সভা

কয়েকদিন আগে সনাতনীদের আরাধ্য বজরংবলীর মূর্তি বিধর্মীদের দ্বারা ভাঙচুর করা হয়। গঙ্গাসাগর সাংগঠনিক জেলার কুলপি প্রখণ্ডে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুবআয়াম, বজরং দলের সদস্য এবং স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ করে সভার আয়োজন করে। প্রশাসনকে বার্তা দেয়া হয়, যে এই ধরনের ঘটনা যদি ভবিষ্যতে ঘটে তাহলে হিন্দু সমাজ বৃহৎ আন্দোলনে যাবে।

তুলসী পূজন

২৫শে ডিসেম্বর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন স্থানে তুলসী পূজার কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দির প্রাঙ্গণে তুলসী মাতার গুণাবলী এবং সনাতনী সমাজে তুলসী চারার গুরুত্ব বোঝানো হয়। সনাতনীদের খ্রিস্টিয় বড়দিন পালনের থেকে তুলসী পূজার দিন হিসেবে ওই দিন পালন করা উচিত।

প্রান্ত বৈঠক

গত ২৭-২৮শে ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক আমতা সরস্বতী মন্দিরে সম্পন্ন হল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সম্পাদক শ্রীঅমিয় সরকার, ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক শ্রীসোহন সিং সোলাঙ্কি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্ব ক্ষেত্রের প্রচারক শ্রীরমাপদ পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। প্রান্তের কার্যকরী সভাপতি শ্রীঅজয় গোয়েল, সহ সভাপতি শ্রীমতি বর্ণালী ব্যানার্জি, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীচন্দ্রনাথ দাস এবং প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী শ্রীমানিকচন্দ্র পাল এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন সদস্য ও জেলার কার্যকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

সেবা কুম্ভ

গত ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যবঙ্গ প্রান্তের সেবাকুম্ভ আয়োজন করা হয় কৃষ্ণনগর সরস্বতী শিশু মন্দিরে। বিভিন্ন সেবা প্রকল্পের শিশুরা তাদের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ প্রদর্শন করে। মাননীয় নন্দলাল লোহিয়া কেন্দ্রীয় সেবা টোলির মার্গদর্শক, শ্রীঅমিয় সরকার ক্ষেত্র সম্পাদক, শ্রীসুধাংশু পাত্র ক্ষেত্র সেবা প্রমুখ, শ্রী বিজয় পাতর সংগঠন সম্পাদক মধ্যবঙ্গ প্রান্ত, প্রান্ত সম্পাদক শ্রীতরুণকুমার লায়েক, শ্রীকুশল কুণ্ডু সহক্ষেত্র সেবা প্রমুখ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তা এবং অভিভাবকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

রাঘব বন্দনায় অযোধ্যা

শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব শুভক্ষণ গবেষণা লব্ধ।
খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২৩ ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার কোশল রাজ্য মধ্য।।
খ্রিস্টপূর্ব ৭৩০৬ ২৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বনাগমন সতেরো বর্ষে।
ছয় দিন পর দশরথ পিতার স্বর্গ লাভ বুধবার অন্ধকার রাত্রে।।
চৌদ্দ ক্রোশ লম্বা পঞ্চ ক্রোশ চওড়া পরিখা জল বেষ্ঠিত অগম্য অযোধ্যা নগর।
দুর্গ রামকোটে কুড়িটি বুরজ সুউচ্চ, আটটি রাজপ্রাসাদ গর্ভের মধ্য।
ঋষভ, পরিক্ষীত, পুষ্য মিত্র, চন্দ্রগুপ্ত দীনা বণিকের দান সামান্য বর্ণন।
ঐ দ্বাপর যুগে মহারাজার কিছু অযোধ্যায় বিগ্রহ রচন।।
সাতবাহন রাজা বিক্রমাদিত্যের খনন করে রাম-সীতা স্থাপন।
এতেক জানিঞা নর না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিতে শ্রীরাম মাত্র ভেলা।।
অযোধ্যা নগরে রম্যে রত্ন গোবর্ণ মণ্ডপে।
মন্দার পুষ্পেরাবদ্ধ বিতানে তোরান্বিতে সিংহাসন সমারাঢ় পুষ্পানৈশ পরি রাঘবম।
অষ্টাচক্র নবদ্বারা দেবানাং পুরাযোধ্যা।
তস্মএং হিরণীয়ঃ কোণ স্বর্গো জ্যোতিষা বৃত (অথর্ব বেদ ঃ ১০/২/৩১)
সাজো সাজো রব আজি পুনঃ মন্দির স্থাপনে রাম জন্ম ভূমি ট্রাস্ট্রে।
পাঁচশত বছর নানা গড়িমসিতে তাঁর ত্রিপলতলে অবশান শীত ও গ্রীষ্মে।।
প্রভু শ্রীরাম আদি জাতি হিন্দুর জনকরাজা বৈদিক যুগে।
দেশ স্বাধীন করে আপোসে মহাত্মা করমচাঁদ কলি কালে।।
সুভক্ত, সুপ্রজা নেতাকর্তা দামোদর মোদী মোহনভাগবত চম্পক রাই সন্ত করসেবী।
পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিল রাম কোঠারি, শরদ কোঠারি ভাই দুই কলকাতাবাসী।

পরিষদ বার্তা

প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দসদা এর অন্তর্গত আনন্দবাজারস্থিত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ত্রিপুরা প্রান্তের সেবা প্রকল্প সাধক রতনমণি সেবা সদনের প্রাক্তন ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৫শে ডিসেম্বর ২০২৫। উক্ত সম্মেলনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন মহামন্ত্রী মাননীয় বিনায়ক রাও দেশপান্ডে মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিশোর বর্মনজী, ত্রিপুরা রাজ্যের বিধায়ক শ্রীযুক্ত রামপদ জমাতিয়াজী, উক্ত বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাসের ট্রাস্টিগণ, ওমকার সেবা মিশন ট্রাস্ট গুজরাটের পদাধিকারীগণ এবং জনজাতি সমাজের বরিষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ ও মাতা এবং ভগিনীগণদের অধিক সংখ্যায় উপস্থিতিতে উপরোক্ত কার্যক্রম সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নেশামুক্তি অভিযান

১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার ব্রহ্মপুর (বহরমপুর) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি ও দুর্গা বাহিনীর দ্বারা নেশা মুক্তি অভিযান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বৈকাল ৩.৩০-র সময় কার্যালয় থেকে নেশা মুক্ত অভিযান যাত্রা বের হয়ে বাসস্ট্যান্ড, সমবায়িকার মোড় হয়ে টেক্সটাইল মোড়ে এসে দুজন বক্তা বক্তব্য রাখেন। তারপর সেই যাত্রা কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়। দুর্গা বাহিনী ও মাতৃ শক্তির সংখ্যা ছিল ৪৫। কার্যকর্তাদের সংখ্যা ছিল ২৮। মোট সংখ্যা ৭৩। জয় শ্রীরাম।

लोभ रहित, कर्म करते हुए, सौ वर्ष जीयें

अरुण चूड़ीवाल

ईशावास्य उपनिषद् का उपनिषदों में प्रथम स्थान है। यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वाँ अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं।

ईशावास्य के प्रथम दो मंत्रों में उपनिषद् का सार आ गया है। इन दो मंत्रों में जीवनशैली की सम्पूर्ण सीमायें निर्धारित कीगयी हैं। तत्त्वज्ञान तथा उसके व्यवहार की प्रकिया इन मंत्रों में है।

ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ।।१।।

उपनिषद कहते हैं कि जिसे भीतर तुमने अनुभव किया, वह पूर्ण है और बाहर जो तुमको दिखता है, वह भी पूर्ण है। इदं की व्याख्या उपनिषद करते हैं - ईशावास्यं इदं सर्वं जो कुछ तुमको दिख रहा है, वह उस ईश्वर से आच्छादित है। भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की है यह 'वस्' धातु से 'वास्यं' शब्द संस्कृत में बनता है। 'वस्' धातु का अर्थ ओत-प्रोत होना, रहना या निवास करना भी होता है।

ईश्वर का अस्तित्त्व बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। जब आँख बन्द करें तो यह सोचें कि हमारे भीतर की सत्ता का हमें बोध हो और जब आँख खोलें तो मानें कि वही चैतन्य बाहर भी आच्छादित है।

ईशावास्यं यह ईश क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो शासन करे, जो सबका संचालन करे, उसका नाम ईश या ईश्वर है।

ईश-शक्ति का हमें दर्शन नहीं होता है, इसका मूलकारण है 'अज्ञान' । अज्ञान के कारण हम कष्ट पाते हैं। साधना की दृष्टि से अज्ञान का कारण है भोगेच्छा या वासना।

अज्ञान क्या करता है? यह हममें कर्ता-बुद्धि उत्पन्न करता है - 'जो कुछ है वह मैंने ही किया है।

दूसरा अज्ञान हममें भोक्ता-बुद्धि उत्पन्न करता है 'मैं भोग करूँगा, मैं सुखी रहूँगा, मैंने इसको कमाया है, तो मैं इसका भोग करूँगा।

उपनिषद कहता है यह ईश्वर ही शासन करता है। वही सब कार्य करता है, वही सबका मलिक है। किन्तु जब हम कहते हैं कि यह हमने किया है, तो हमारा अहंकार दृढ़ होता है।

हम थोड़ा-सा विचार करके देखेंगे तो पायेंगे कि इस संसार में वस्तुतः हम कहीं के मालिक नहीं हैं, पर यह हमारे ध्यान में नहीं रहता है।

जब हमने जन्म लिया तो क्या भगवान ने हमसे पूछा था कि तुम कहाँ जन्म लेना चाहते हो?

जन्म, मृत्यु, जीवन-मरण में हमारी स्वाधीनता नहीं है। मृत्यु के समय यमराज क्या हमें पूछकर ले जाते हैं? एक झटके में हम चले जाते हैं।

इन घटनाओं से यह बात समझ में आती है कि कर्ता तो वही है, मैं कुछ नहीं हूँ। -'**ईशावास्यं इदं सर्वम्** वही ईश, परमात्मा, मेरे जीवन का संचालन कर रहा है। वही परमात्मा सारे जगत को चलाता है। जब यह बात समझ में आयेगी तो उसका पहला लक्षण यह होगा कि अहंकार टूटने लगेगा।

जैसे-जैसे अहंकार टूटता जायेगा, वैसे-वैसे हमारे अन्दर सत्य आविर्भूत होता जायेगा। चैतन्य सत्ता का प्रकाश हमारे भीतर आता जायेगा। हम धीरे-धीरे अनुभव करने लगेंगे कि ईश्वर ही बाहर और भीतर है, वही सत्य है।

इसका उपाय क्या है? इस मन्त्र का दूसरा भाग है **'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्'** । ऋषि कहते हैं त्याग के द्वारा भोग करो। वे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि संन्यासी ही हो जाओ। इस संसार में हो तो संसार का भोग करो। पर कैसे? त्यागपूर्वक भोग करो। किसी के भी धन का लोभ मत करो।

उपनिषद यह सूत्र बता रहा है **मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।** गृधः माने लोभ और गिद्ध पक्षी को भी संस्कृत में गृध कहते हैं। गिद्ध पक्षी क्या करता है? चाहे वह जितनी भी ऊँचाई पर उड़े, किन्तु उसकी दृष्टि सड़े हुये मुर्दों पर ही रहती है।

इसलिये **'मा गृधः'** - लोभ मत करो। **'कस्यस्विद्धनम्'** आचार्य कहते हैं न दूसरे के और न अपने धन का लोभ करो।

धन के लोभसे बचने का एक उपाय है कि हमेशा यह स्मरण रहे कि इस धन का मैं मालिक नहीं हूँ। संसार में हमें सम्पत्ति की आवश्यकता होती है, किन्तु सम्पत्ति से आसक्ति मत करो। जीवित रहने के लिये भोग करें, किन्तु आसक्त न हों!

विचार करके देखो, आज तक तुमने जो भोग किया, क्या उन भोगों से तुम्हें स्थायी सुख या शान्ति मिली है? हम सबका अनुभव यह बताता है कि नहीं, हमें स्थायी सुख या शान्ति नहीं मिली है।

ईशावास्य का द्वितीय मंत्र है :-

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।।२।।

- इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करते हुये सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिये। ऐसे निष्काम, ईश्वरार्थ कर्म करके व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता है।

गीता हमें बताती है कि इस जगत् में तुम बिना कर्म के नहीं रह सकते। उपनिषद हमें कहता है कि कर्म करते हुये ही **'शतं समाः जिजीविषेत्'** सौ साल तक जीने की इच्छा करो। संसार में आये हो तो संसार से भागो मत। यह कर्मक्षेत्र है। इस कर्मक्षेत्र में रहकर ही मुक्ति का विधान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी।

कर्म करते हुये दीर्घ जीवन जीने की इच्छा करो - यदि ऐसी इच्छा करोगे तो **'न कर्म लिप्यते नरे'** इस संसार में कर्म करते हुये भी इसमें लिप्त नहीं होगे। अकर्मण्य मत बनो।

उपनिषद मनुष्य के चेतना के विकास की प्रक्रिया है, चैतन्य के विकास की प्रक्रिया है।

हमारे जीवन में तीन इच्छायें हमेशा होती हैं -

(१) जीजीविषा - जीने की इच्छा ।

(२) जिज्ञासा - जानने की इच्छा ।

(३) सुखेच्छा - आनन्द या सुख पाने की इच्छा ।।

ये तीन इच्छायें हमेशा रहती हैं।

वेदान्त में आत्मस्वरूप को सत्-चित्-आनन्द कहा गया है। यह हमारा स्वभाव है। सत् या सत्य का स्वरूप है कि वह शाश्वत रहता है। हमे भी हमेशा जीवित रहने की इच्छा होती है।

यह सत्, ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप है। इसलिये हमें जीने की निरन्तर इच्छा बनी रहती है।

चित् कहते हैं ज्ञान को। हमारे भीतर ज्ञान-प्राप्ति की बहुत इच्छा रहती है। संसार में जो कुछ है, उसे हम जान सकें, ऐसी हम इच्छा करते हैं। इससे ज्ञानानन्द मिलता है। इस मन्त्र में कहा गया है जिजीविषेत् - जीने की इच्छा करो। भोग की इच्छा मत करो।

मनोविज्ञान का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य बिना किसी प्रयोजन या फल की आशा के बिना उद्देश्यहीन होकर न तो कार्य कर सकता है और न ही कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है।

मनुष्य के जीवन में आन्तरिक और बाह्य ये दो प्रकार के बन्धन रहते हैं। हम हमेशा अनुभव करते हैं कि हम काम, क्रोध लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अपनी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं और वासनाओं के बन्धन, में हैं।

हम लोग भीतर के बहुत से बन्धनों से बंधे हुये हैं और इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वरूप है- नित्य-मुक्त-शुद्ध-बुद्ध-चैतन्य आत्मा। मुक्ति की इच्छा हमारे जीवन की मौलिक इच्छा है।

किसी-न-किसी जन्म में मनुष्य को यह अवश्य लगेगा कि मैं अन्दर और बाहर दोनों बन्धनों से मुक्त हो जाऊँ। मुक्ति की इच्छा को दबाया नहीं जा सकता।

हमें मुक्ति की इच्छा को सत्संग, सद्ग्रन्थों आदि के द्वारा प्रबल बना देना चाहिये। अगर यह इच्छा प्रबल हो गयी, तब समझ में आयेगा कि कर्म में आसक्ति हमारे बन्धन का कारण है।

जब मुक्ति की इच्छा और बन्धन का बोध, ये दोनों हमारे जीवन में संघर्ष के रूप में चलते हैं, तब समझ लेना चाहिये कि हम उन्नति के रास्ते पर हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ हुआ है।

इस संसार में मूढ़, (अज्ञानी) और परमात्मा में समाहित व्यक्ति, ये दोनों ही सुखी रहते हैं। इसके अतिरिक्त सभी लोग दुःख कष्ट भोगते-रहते हैं।

इस दूसरे मन्त्र में कहते हैं कि **कुर्वन्नेवेह कर्माणि** - यदि इस प्रकार का कर्म तुम भगवान के लिये करते हुये अपना जीवन बिताओ तो इस कष्ट से तुम बच सकते हो।

जिजीविषेत् शतं समाः हम दीर्घ जीवन चाहते हैं। किन्तु जीवन सार्थक नहीं हुआ तो उससे क्या लाभ है? दूसरों के लिये कुछ नहीं किया, केवल अपने लिये ही जिया तो, वैसे जीवन से क्या लाभ हुआ?

जीवन की सार्थकता आत्मविजय में है। अपने शरीर और मन का स्वामी होकर इस संसार का भोग करने के लिये जब व्यक्ति समर्थ हो तभी उसके जीवन में शान्ति हो सकती है।

प्रकृति से हमारा जन्म हुआ है, तो कर्म तो छूटेगा नहीं, पर कर्तापन से छुटा जा सकता है। व्यक्ति अगर कर्तापन छोड़ दे, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं।

कर्म हमको नहीं बाँधते। उसके पीछे जो भावना है, वह हमें बाँधती है।

अगर अपने स्वार्थ के लिये कर्म कर रहे हैं तो वह बन्धन का कारण हो जायेगा। यदि वही कर्म हम ईश्वर-प्रीत्यर्थ कर रहे हैं, तो वह कर्म हमारे मुक्ति का कारण हो जायेगा।

पहले मन्त्र में साधना का संकेत है, तत्त्व की बात है। दूसरे मन्त्र में साधना का सार है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन ब्रह्मलीन स्वामी सत्यरूपानन्दजी, सचिव, रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर के प्रवचन के अंश हैं।

''সব সময় অন্যের কল্যাণ করার চেষ্টা করো দেখবে ঈশ্বর নিজে থেকেই তোমার কল্যাণ করেছেন।'' —স্বামী বিবেকানন্দ

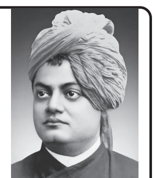

বিক্ষোভ মিছিল ও পদযাত্রা, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবাদ সভা, তারকেশ্বর, মধ্যবঙ্গ

বজরঙ্গ দলের বিক্ষোভ প্রদর্শন, কাঁথি, দক্ষিণবঙ্গ

প্রতিবাদ সভা, কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের ভিসা অফিস বন্ধ করল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, উত্তরবঙ্গ

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3589

15th January, 2026
Price : Rs. 15 only

RNI NO. : 30136

কেন্দ্রীয় প্রন্যাসী মণ্ডলের বৈঠক

কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলের বৈঠক

সৌজন্যে :

‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in